ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386


# স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ১১ সংখ্যা ।। ২২ কার্তিক, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৯ নভেম্বর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com


## দিল্লির রামলীলা ময়দানে মোহন ভাগবত

# 'সজ্জন শক্তি'ই পথ দেখাতে পারে রাজনীতিকে

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** গত ২৯ অক্টোবর, দিল্লীর রামলীলা ময়দানে প্রায় ঘণ্টাখানেক ব্যাপী তাঁর দেওয়া বক্তৃতায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বলেন, রাজনৈতিক দল, তাদের নেতা এবং স্লোগানগুলি ভস্মে পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র 'সজ্জন শক্তি' (ইতিবাচক শক্তি) তাদেরকে সঠিক পথে ফেরাতে পারে। শ্রীভাগবত আরও বলেন, "রাজনীতি এমন কোনও বিষয় নয় যা সমাজকে একত্রিত করতে পারে। তাই আমাদের কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সমাজ আশা করে রয়েছে যে সজ্জন-শক্তি রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের নেতাদের সঠিকপথে পরিচালিত করবে।"

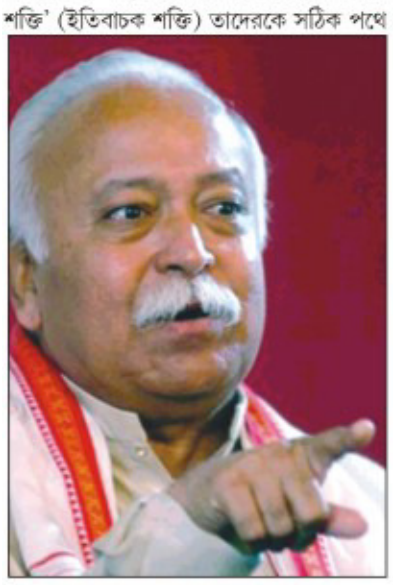

বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন মোহনরাও ভাগবত। তাঁর বক্তব্যে দেশের রাজনীতিকে শুদ্ধিকরণের ওপর জোর দেন তিনি। স্পষ্ট করেন রাজনীতির সঙ্গে আর এস এসের সম্পর্কটাও। তিনি বলেন, "আমরা চাইলেও রাজনীতি করে পথভ্রষ্ট হওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের সঠিক পথে আনতে পারতাম না। সঙ্ঘ চাইলে আগেই নির্বাচনী রাজনীতিতে যোগ দিতে পারত। তাহলে আমাদের কর্মীদের আর জনসঙ্ঘে পাঠাতাম না।" মোহনজীর বক্তব্য থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি হারার পর থেকে যারা প্রকাশ্যে বলেছিলেন, সঙ্ঘের উচিত বিজেপি-কে অধিগ্রহণ করা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাদেরকে পাত্তা দিচ্ছে না। আরও একটা জিনিস লক্ষণীয়। মোহন ভাগবত তাঁর বক্তৃতায় কোনও রাজনৈতিক দলের নাম বা তাদের নেতাদের নামোল্লেখ করেননি।

কিন্তু তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে আঙুলটা কিন্তু বিজেপির দিকেই। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বিজেপিকে নিজের প্রচেষ্টাতেই আবার অন্য ধরনের রাজনৈতিক দল (পার্টি উইথ ডিফারেন্স) হয়ে উঠতে হবে।

দিল্লীর রামলীলা ময়দানে আয়োজিত জনসভার এই মঞ্চ থেকে আর এস এস সম্পর্কে যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা দূর করার চেষ্টা করেছেন ভাগবত। সঙ্ঘ সম্পর্কে বলেছেন, 'এখানে আসতে গেলে কোনও টাকাকড়ি লাগে না এবং কেউ বেরিয়ে যেতে চাইলে তাঁর ওপর কোনও জোর খাটানো হয় না। সুতরাং আসুন, আমাদের এখানে যোগদান করুন। **(এরপর ৪ পাতায়)**

# গো-সম্পদ বাঁচাতে চাই গোশালা ও গোচারণ ভূমি ঃ প্রবীণ তোগাড়িয়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** রীতিমতো গমগম করছে তাঁর কণ্ঠস্বর— "দেশের ধন কোথায় গেল? দেশের অন্ন কোথায় গেল? কোথায় গেল আরোগ্য?" উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ নিরুত্তর। এবার সেই শ্রোতৃবর্গের দিকে ধেয়ে এল একটা প্রশ্নবাণ— "গো-সেবা মানে কার সেবা? গো-জাতির নাকি আমাদের?" শ্রোতৃবর্গের কপালে তখন দেখা যাচ্ছে বিন্দু বিন্দু জলকণা। জলকণার উৎস আকাশের হিম না চর্ম নিঃসৃত ঘাম সেটা বোঝা মুশকিল। আচমকা প্রশ্নে ভ্যাবাচাকা খাওয়া শ্রোতৃবর্গের একেবারে সামনে থেকে একটা মৃদু গুঞ্জন ওঠার চেষ্টা হলো— 'গো-সেবা মানে গো-জাতির সেবা'। কিন্তু আবার সেই উচ্চকিত কণ্ঠস্বরে থেমে গেল যাবতীয় গুঞ্জন— "গো-সেবা মানে আমাদের সেবা।" প্রাক-শীতের সন্ধ্যায় এভাবেই মহানগরী কলকাতার কাছে ধরা দিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক প্রবীণভাই তোগাড়িয়া।

উপলক্ষটা বলাই বাহুল্য, বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা। যে যাত্রার রথ গত ২ নভেম্বর রাসপূর্ণিমার দিন বারাসাত পেরিয়ে ঢুকে পড়েছিল মহানগরী কলকাতার বুকে। সেই কারণেই ওইদিন সন্ধ্যের সময় কলকাতার পূর্বপ্রান্তে কাঁকুড়গাছি পার্কে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে মুখ্য বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। সমাবেশের সময় যত গড়িয়েছে, বোঝা গিয়েছে সভায় উপচে পড়া শ্রোতৃবর্গ উত্তেজনায় গলগল করে ঘামছেন।

মঞ্চে ভাষণরত প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। উপবিষ্ট অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

তাঁর বক্তব্যে প্রবীণভাই নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব্যাখ্যা করে **(এরপর ৪ পাতায়)**

# জ্যোতিবাবুর আহ্বানে কংগ্রেসের বাম-বিরোধিতার বেলুন ফাঁস

**গূঢ়পুরুষ।।** লোকসভার নির্বাচনের পর এবার বিধানসভার ১০টি আসনে উপনির্বাচন। এই ১০টি আসনের সাতটিতে বিরোধীরা অতীতে জয়ী হয়েছিল। তাই ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে বিরোধী জোট প্রার্থীরাই 'অ্যাডভান্টেজ'-এ আছেন। উপনির্বাচনের ফলাফলে রাজ্য রাজনীতিতে তেমন প্রভাব পড়ার কথ নয়। শুধু দেখার যে ১০টি আসনই বিরোধীরা দখলে আনতে পারে কী না! পারলে বাম দলের কর্মী সমর্থকদের মনোবল একেবারে তলানিতে ঠেকবে। সেক্ষেত্রে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইতে বামফ্রন্ট নিশ্চিতভাবেই হারবে। এই কারণেই অতি বৃদ্ধ অশক্ত জ্যোতি বসুকে রাজনীতির তরজায় যোগ দিতে বাধ্য করেছে পার্টি। পশ্চিমবঙ্গে 'কংগ্রেস-সিপিএম ভাই ভাই'

**(এরপর ৪ পাতায়)**

## ডান-বামের নগ্ন মুসলিম তোষণ

# অকারণে দাঙ্গা বাধাতে চাইছে মুসলমানরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** রাজনৈতিক দলগুলির সীমাহীন তোষণের ফলে ইদানীং এরাজ্যের মুসলমানরা নানা অছিলায় দাঙ্গা বাধাতে চাইছে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে গত দু-মাসে এমন চারটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। যেখানে মারমুখী মুসলিমরা হিন্দুদের আক্রমণ করে। তার মধ্যে দুটি ঘটনা কলকাতা শহরেই। হিন্দুরা সহনশীল হয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করায় কোনও বড় অঘটন ঘটেনি। কিন্তু হিন্দুদের এই সহনশীলতাকে মুসলিমরা যদি দুর্বলতা ভেবে থাকে তাহলে তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করছে। হিন্দুরা খেপে গেলে কি হতে পারে তার প্রমাণ গুজরাট, ভাগলপুর, জামশেদপুরে দেখা গিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির তোষামোদের রাজনীতি তাদের আক্রান্ত হিন্দুদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না, তা বোঝার সময় এবার এসেছে। কোনও সভ্য সমাজে দাঙ্গা কাম্য নয়। তা বলে, পড়ে পড়ে মার খাওয়াও সমীচীন নয়।

এপ্রসঙ্গে গত দু-তিন মাসের চারটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। অতি সম্প্রতি পার্ক সার্কাসের মোড় দিয়ে এক জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বিসর্জনের শোভাযাত্রাকে মসজিদ থেকে আক্রমণ করা হয়। এই ঘটনায় সারারাত পার্ক সার্কাস অঞ্চলে তাণ্ডব চলে। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজেও ইট ছোঁড়া হয়। একতরফা আক্রমণ চালায় ওই অঞ্চলের মুসলিমরা। হিন্দুরা সংযত থাকায় পরিস্থিতি খারাপ হয়নি। এর কিছুদিন আগে বেলগাছিয়ায় সামান্য বিষয়কে ঘিরে মুসলমানরা অযথা হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রতিরোধে হিন্দু মা-বোনেরাও সামনের সারিতে ছিল। দুর্গাপুজোর বিসর্জনে বীরভূমের রামপুরহাট এবং মল্লারপুরে একই ঘটনা ঘটে। এছাড়া বছর খানেক আগে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে দাঙ্গা মোকাবিলার জন্য সেনা ডাকতে হয়েছিল। স্টেটসম্যান অফিসে হামলার ঘটনাও সবার জানা। মুশকিল হলো, সমস্ত ঘটনার পিছনেই দেখা যাচ্ছে, সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের নজিরবিহীন মুসলিমদের তোষণের

**(এরপর ৪ পাতায়)**

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!

SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।

যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।

যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –

Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221

SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

# সি পি এম, সি পি আই মাওবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ঃ শ্রীতোগাড়িয়া

*কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রবীণভাই তোগাড়িয়া।*

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** "বামফ্রন্ট সরকার মাওবাদীদের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণেই রাজ্যে মাওবাদী সমস্যা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে"— ঠিক এই ভাষাতেই রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। গত ২ নভেম্বর বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা উপলক্ষে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন শ্রীতোগাড়িয়া। মাওবাদী সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারের উচিত মাওবাদীদের ওপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইন-শৃঙ্খলা বলবৎ করা। সেই সঙ্গে মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়ণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের কথাও বলেন তিনি।

ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার মাওবাদী সমস্যার বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, এর জন্য তিনি সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছার অভাবকে দায়ী করেন। মাওবাদী নিয়ন্ত্রণে কংগ্রেসকেও এদিন একহাত নেন তিনি। তাঁর মতে, কংগ্রেসের বিচারধারা মাওবাদের সঙ্গে সংপৃক্ত না হলেও, কংগ্রেস মাওবাদী সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট নয়। যার ফলস্বরূপ দেশ জুড়ে মাওবাদী সমস্যা আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এর সমাধানের জন্য কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন তিনি।

শ্রীতোগাড়িয়া কেন্দ্র সরকারকে সাবধান করে বলেন, চীন ও পাকিস্তান ভারতকে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল করতে মাওবাদীদের কাজে লাগাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বে মুসলিম সন্ত্রাসবাদ ছাড়া অন্য ধর্মে সন্ত্রাসবাদ দেখতে পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্মে হিংসার কোনও স্থান নেই।

এদিন সংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গের সহ-সভাপতি নন্দলাল লোহিয়া, বিমল লাঠ ও বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার স্বাগত সমিতির সম্পাদক দিলীপ আঢ্য।

**স্বস্তিকার দাম**
**প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা**
**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য**
**সডাক্ - ২০০.০০ টাকা**

## এই সময়

### ২৬/১১ আতঙ্ক

২৬/১১-র আতঙ্ক এখনও পিছু ছাড়ছে না বিদেশি পর্যটকদের। মুম্বাই হামলার পর ভারতে আসতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গত ১১ মাস ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদেশের পর্যটন শিল্প। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতীয় অর্থনীতিও এর ফলে কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে। খোদ সরকারি হিসাবেই দেখা যাচ্ছে মুম্বাই হামলার পর ৩,২৫ লক্ষ টাকার পর্যটন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত। ২৬/১১-র ঘটনার পর বিদেশি পর্যটকেরা তাঁদের বুকিং বাতিল করতে থাকেন। এর ২০০৮-এর ডিসেম্বরে ৭৫ হাজার বিদেশি পর্যটকই কেবল মুম্বাই আসে। যা বিগত বছরগুলির তুলনায় অনেক কম। ২০০৮-এ জানুয়ারিতে বিদেশি পর্যটক ছিল ৫.৯ লক্ষ। ২০০৯-এ দাঁড়ায় ৪.৮ লক্ষ। ২০০৮-এর ফেব্রুয়ারিতে ৫.৬ লক্ষ। ২০০৯-এ তা হয় ৫ লক্ষ। ২০০৮-এর মার্চ মাসে ছিল ৫.৪ লক্ষ। ২০০৯-এ তা হয় ৪.৭ লক্ষ। গত ছ'মাসে এইভাবেই হ্রাস পেয়েছে পর্যটকদের ভিড়।

### মারণ ব্যাধি

Pneumonia (নিম্যুনিয়া) উচ্চারণের মতোই কঠিন হয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে এই মারণ রোগের প্রতিরোধ। খোদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু'র প্রতিবেদনই বলছে, ভারতে প্রতি মিনিটে কোনও না কোনও শিশু প্রাণ হারাচ্ছে এই রোগে। একই অবস্থা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীনসহ বিশ্বের আরও ১৫টি দেশের। বিশ্বের ২০ শতাংশ শিশুর মৃত্যুর পিছনে রয়েছে নিম্যুনিয়া রোগের ভাইরাস। হু'র মতে, অপুষ্টি, বায়ুদূষণ, সচেতনার অভাবেই বাড়ছে মারণ রোগের সংক্রমণ। ভারতে ৪৪ মিলিয়ন, চীনে ১৮ মিলিয়ন, পাকিস্তানে ৭ মিলিয়ন, বাংলাদেশে ৬ মিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়ায় ৬ মিলিয়ন, ব্রাজিল ৪, গোয়ায় ৩, ফিলিপিন্স-এ ৩, আফগানিস্তানে ২, ইজিপ্টে ২, মেক্সিকোয় ২, সিডেনে ২, ভিয়েতনামে ২ ও নাইজেরিয়ায় ৭ মিলিয়ন শিশু এই রোগে আক্রান্ত।

### অস্থায়ী সরকার

জম্মু-কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস পরিচালিত সরকারকে অস্থায়ী সরকার বলে কটাক্ষ করছে বিজেপি। বিজেপির মতে, ওমর আবদুল্লার সরকার জনগণের কোনও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। উপরন্তু জনগণকে অযথা অশান্তি ভোগ করতে হচ্ছে। জম্মুর অশান্ত পরিবেশের জন্য আবদুল্লা সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সরকার বেশিদিন মসনদে টিকে থাকতে পারবে না বলেও মনে করছে বিজেপি নেতৃত্ব। কাশ্মীরের উত্তপ্ত পরিবেশ সামাল না দিতে পারার জন্য সরকারকে জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছে বিজেপি।

### বেকায়দায় কোডা

রীতিমতো বেকায়দায় পড়েছেন মধু কোডা। আয়কর দপ্তরের তল্লাশি নাকানি-চোবানি অবস্থা ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মধু কোডার। এদিকে নির্বাচনের আগে তাঁর দুর্নীতির কর্মকাণ্ড ফাঁস করতে মাঠে নেমেছে বিজেপি। ফলে শাঁখের করাতের আক্রমণে নির্বাচন নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবতে পারছেন না কোডা। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি-হীন সম্পত্তি রাখার অভিযোগে আয়কর দপ্তর তাঁকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। বিজেপি নেতৃত্ব পুরো ঘটনায় কোডা ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছে। বিজেপির মতে কংগ্রেসের যোগসাজসেই মধু কোডা টাকার পাহাড় জমা করেছে। আসলে ভোটের আগে টাটকা ইস্যুকে হাতছাড়া করতে চাইছে না বিজেপি।

### দুর্নীতি ঠেকাতে

প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতি রোধে সফটওয়্যারকে হাতিয়ার করতে চলেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। বহিনজী রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্ম দুর্নীতি ঠেকাতে একটি বিশেষ সফটওয়্যারের সাহায্য নিচ্ছেন। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিজস্ব ফাইলকে লোড করে রাখা যাবে। সময় মতো এই সমস্ত ফাইলের আপডেটও হবে। সেই সঙ্গে থাকছে প্রশাসনিক কাজকর্মের বিভিন্ন ফাইলও। যা 'লক' করা থাকবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে। যাতে তা বাইরে ফাঁস না হয়ে যায়।

### সজাগ দৃষ্টি

জঙ্গিরা যাতে ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্যবহার করতে না পারে, সেই লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলিকে সতর্ক করল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। জঙ্গিরা এদেশে টাকা জমিয়ে যাতে তার ফায়দা না তুলতে পারে তার জন্য একাধিক সুরক্ষা কবচের কথা বলছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। নিরাপত্তার খাতিরে জাতীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তারা। আগামী দিনে যারা ব্যাঙ্কে নতুন একাউন্ট খুলছে, তাদের পরিচয়পত্র যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আশঙ্কা জঙ্গিদের একটা গ্রুপ এদেশের অর্থনীতিতে থাবা বসাতে চাইছে। তার প্রতিরোধেই সম্প্রতি বিভিন্ন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। জীবন বিমার ক্ষেত্রেও এমনই সাবধানতার কথা বলেছে বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

### ষড়যন্ত্র

দেশজুড়ে ধর্মান্তরকরণের মতো ষড়যন্ত্রে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপির সভাপতি রাজনাথ সিং। ভূপালে এক অনুষ্ঠানে তিনি ধর্মান্তরকরণ রোধে আইন প্রণয়নের দাবী তোলে। তাঁর মতে, গণধর্মান্তরকরণ হিন্দু সমাজের কাঠামোকে ধ্বংস করছে। এটা সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র। আইনের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ রোধের ওপর জোর দেন তিনি। এর পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন শ্রীসিং।

*জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী*

# সম্পাদকীয়

## সন্ত্রাসবাদ গণতন্ত্র বিরোধী

সন্ত্রাসবাদ আজ সমগ্রদেশে বিশেষ করিয়া পশ্চি মবঙ্গে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের একমাত্র সোপানে পরিণত হইয়াছে। উদারতা, সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়িয়া তুলিয়া জনমতের ওপর নির্ভরতা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এক সময়ে ছিল নকশালপন্থী আন্দোলনের নামে ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি। সেই আন্দোলনেরই ধারাবাহিক রূপ এই মাওবাদী দল। তবে মাওবাদীদের আজকের নেতাগণ নকশাল বাড়ির আন্দোলনের কথা খুব একটা বলে না। কারণ ইহাই যে আজকের মাওবাদীগণ নিছকই একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী; ইহাদের কোনও ঐতিহ্যের বালাই নাই। সেদিনের সেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে তবু কৃষি-বিপ্লব যুক্ত ছিল। ভূমিহীন কৃষকদের লড়াই ছিল ভূস্বামী, জোতদারদের বিরুদ্ধে। আজকের মাওবাদীদের কোনও লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই; তাহাদের একটাই লক্ষ্য : হিংসা ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করা। জঙ্গলমহলে মাওবাদীরা যে নৃশংস হিংস্রতা চালাইতেছে, তাহার বেশিরভাগ বলি-ই হইতেছে হতদরিদ্র মানুষগণ; কেউ দিনমজুর, কেউ ক্ষেতমজুর, কেউ বা সামান্য কনস্টেবল। মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে খুন, সংঘর্ষ, গৃহে অগ্নিসংযোগের ঘটনা চলিতেছে বিরামহীন। প্রশাসনের কি কিছুই করার নাই?

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সন্ত্রাসবাদ উদার, সহিষ্ণু ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। সন্ত্রাসবাদ জনগণের উদার মতামতে আস্থাহীন একদল অসহিষ্ণু অসুস্থ মানুষের অবলম্বন মাত্র। একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর মাধ্যমে নিজের বা নিজের তাঁবেদারদের ক্ষমতা দখলের উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। আর সন্ত্রাসের মাধ্যমে যাহারা ক্ষমতা দখল করে, ক্ষমতা টিকাইয়া রাখিতে তাহারা চতুর্গুণ সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়, ইতিহাসের শিক্ষা। উইলিয়াম শেক্সপীয়ার তাঁহার 'ম্যাকবেথ' নাটকে ম্যাকবেথকে এমনই একজন হিংস্রতার প্রতীক হিসেবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ম্যাকবেথ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন বলিষ্ঠ ও সৎ মানুষ। কিন্তু একবার হিংসার আশ্রয় লইয়া বৃদ্ধ রাজাকে খুন করিয়া ক্ষমতা দখল করার পর তাহাকে ক্ষমতা টিকিয়া রাখিতে আরও বহু হত্যালীলা চালাইতে হইয়াছিল। ক্লান্ত ম্যাকবেথকে শেষ জীবনে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল এই বলিয়া যে, আমি রক্তের নদী বহিয়া এতদূর আসিয়াছি যে ফিরিতে গেলেও সেই রক্ত ঠেলিয়াই ফিরিতে হইবে। এই অত্যাচারী ম্যাকবেথকে বধ করিতে গিয়া ম্যালকম যখন নিজেই তরবারির সাহায্য লইয়াছিল তখন নিজেই সন্দেহ করিয়াছিল এই বলিয়া 'ম্যাকবেথকে পরাজিত করে যে রাজা হবে সে তার থেকে আরও বেশি দুর্বৃত্ত ও অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারে।'

হিংসার দ্বারা কোনও শুভ কাজই সম্ভব নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের ইতিহাসেও ঠিক এমনটিই ঘটিয়াছিল। অলিভার ক্রমওয়েল (১৫৯৯-১৬৫৮) শক্তি প্রদর্শনেই তিনি মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বুলি আওড়াইয়াই ইংল্যান্ডের পরিত্রাতা লর্ড হিসাবে ক্ষমতাশালী কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি হইয়া উঠিয়াছিলেন এক ঘৃণ্য অত্যাচারী শাসক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরে বাইরে' নাটকে এই সন্ত্রাসের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভেরও বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কারণ তাঁর মতে সে দেশের মানুষ দেবতা থেকে পেয়াদা পর্যন্ত সকলকে ভয় করে আধমরা হইয়া যাইতেছে। মুক্তির নাম করে অত্যাচারের দ্বারা সেই কাপুরুষতার ওপরে দেশের জয়ধবজা লাগাইবে? তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন এই বলিয়া : দেখো, দাসত্বের যে বিষ মজ্জার মধ্যে আছে সেইটেই যখন সুযোগ পেয়ে বাইরে ফুটে ওঠে তখনই সেটা সাংঘাতিক দৌরাত্ম্যের আকার ধারণ করে।'বউ হয়ে যে মার খায় শাশুড়ি হয়ে সেই সবচেয়ে বড়ো মার মারে।' অতএব কোনও সত্যের অজুহাতেই সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন শুভ ফলদায়ক নয়।

## জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

*আমাদের দেশের সহস্র দেশভক্ত বীর ও নেতৃবৃন্দ হিন্দুস্থানের মুক্তির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। এমন কি আজও অজস্র ভারতবাসী নিয়ত নিহত হইতেছে।*

*স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনে বহুজনকে প্রাণ দিতে হইবে। তদপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তি আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহা নাটকে বহু জন তাঁহাদের নিজ নিজ অংশে অভিনয় করিয়াছেন এবং আত্মত্যাগের পথে মঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আন্দোলন থামে নাই, পরন্তু তাহা বাড়িয়াছে। এবং ক্রমশঃ তাহা লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।*

*আমি হয়তো আগামীকাল চোখ বুজিব, কিন্তু আপনাদেরই মধ্যে কোনও একজনকে আমরা স্থান পূরণ করার জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে। তিনি যদি গত হন, তাহা হইলে আর একজন তাঁহার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ভারতবাসীর ইহা একটি পবিত্র কর্তব্য বিশেষ। উত্তরকালে হিন্দুস্থান তাঁহার জন্য গৌরব অনুভব করিবে। এই মরণসঙ্কু ল মহারণ হইতে আপনি যদি ভাগ্যবশে বাঁচিয়ে থাকিতে পারেন তাহা হইলে আপনি বীর বলিয়া পরিচিত হইবেন এবং যদি আপনাকে মৃত্যু বরণ করিতে হয় তাহা হইলে আপনি মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ হইবেন।*

*— রাসবিহারী বসু*

# প্যাটেল ও দেশবিভাগ

**নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত**

যশোবন্ত সিংহের যে সাম্প্রতিক বইটা সারা দেশে আলোড়ন তুলেছে, তাতে দেশভাগের ব্যাপারে গান্ধীজী, জিন্না, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ নেতাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্যাটেল সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ণ নিয়েও কিছু লেখা দরকার বলে মনে করি।

সর্দার প্যাটেল সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, (১) তিনি এই ব্যাপারে অন্তত নেহরুর মতো দায়ী ছিলেন না এবং (২) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনের ব্যাপারে তিনি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীসিং-এর দ্বিতীয় বক্তব্যটা অবশ্যই যথার্থ। দেশভাগের সময় 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন' অনুসারে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলোকে (সংখ্যায় ৫০০-রও বেশি) ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে কোনও একটার অঙ্গীভূত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাদের অধিকাংশকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করাটা ছিল একটা বিরাট জটিল সমস্যা, কারণ তাদের ভারতে যোগ দেওয়ার বিরোধী ছিল। কিন্তু এটা অত্যন্ত 'delicate question' হলেও বুদ্ধিমত্তা, তৎপরতা, সহৃদয়তাও, দৃঢ়তার দ্বারা সর্দার প্যাটেল এই কাজটা করতে পেরেছিলেন (আই. জে. প্যাটেল—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পৃ.১৫২)। ঐতিহাসিক ড. নিমাইসাধন বসু বক্তব্য করেছেন, '...it was accomplished mainly by the efforts of Sardar Patel.' ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, পৃ, ১৪০)।

কিন্তু স্পষ্ট করেই বলা দরকার, দেশভাগের ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলের দায়িত্বকে লঘু করে দেখা চলে না, বরং বলা যায়, এক্ষেত্রে তিনিও একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। এবং বিশ্লেষণ করলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এটা অবশ্য ঠিক যে, প্রথম দিকে তিনিও দেশভাগের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সঙ্কটটা যখন জটিল আকার ধারণ করেছে, তখন তিনিও সম্ভবত বুঝেছেন এবং শুধু দেশবিভাগের প্রস্তাব মেনে নেননি অন্য নেতাদেরও এই ব্যাপারে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং, এই ব্যাপারে তিনি তাঁর দায় এড়িয়ে যাবেন কেমন করে?

লর্ড মাউন্টব্যাটেন বড়লাট হয়ে ভারতে এসেছিলেন জটটা ছাড়ানোর জন্য। কারণ ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ঘোষণা করেছিলেন ১৮ই জুনের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নিতে চায়। মাউন্টব্যাটেন ভারতে এসেই বুঝেছিলেন যে, জিন্না প্রমুখ লীগ নেতারা দেশবিভাগ ছাড়া অন্য কিছুতে রাজী হবেন না। সরকারের তরফ থেকেও জিন্নাকে বোঝানো হয়েছিল যে, তিনি গোঁ ধরে থাকলে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবেই। বলা চলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের হয়ে খেলেছেন। তিনি পরে স্বীকারও করেছেন যে, তিনি তখন একগুঁয়েমির পরিচয় না দিলে পাকিস্তান পাওয়া যেত না (ডরোথী নর্ম্যান নেহরু, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৬২)।

সেইজন্যেই মাউন্টব্যাটেনের কাজটা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত কংগ্রেস নেতাদের বশীভূত করা। গান্ধীজী আগে অনেক বড় বড় কথা বলেছেন, দেশভাগ করতে হলে নাকি তাঁর মৃতদেহের ওপরেই সেটা করতে হবে, সারাদেশ আগুনে জ্বললেও নাকি তিনি দেশকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেবেন না। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন কৌশলে তাঁকে দ্বিতীয় বৈঠকের দ্বারা আলোচনার টেবিল থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। গান্ধীজীর প্রস্তাব কংগ্রেসই মেনে নেয়নি, ক্ষোভে অভিমানে তিনি বিহারে চলে গেছেন, বৈঠকী রাজনীতিতে আর কোনও অংশই নেননি।

বড়লাটের কাজটা তাতে অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে। তিনি এবার ভেবেছেন সর্দার প্যাটেলকে। তিনি অবশ্য জানতেন যে, প্যাটেলও অবিভক্ত ভারতের প্রবক্তা এবং তিনি বেশ শক্ত মানুষ--তাঁকে বশীভূত করাটা বেশ কঠিন ব্যাপার। সেইজন্য সর্দারের সঙ্গে বৈঠকের আগে তাঁর বেশ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখিয়েছে। বড়লাটের প্রেস সেক্রেটারি অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, 'Mountbatten had been somewhat apprehensive about his first meeting with Patel who had the reputation of being the strongman in the High Command'---মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, পৃ.৩৬)।

কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো তিনি একটা বৈঠকেই সর্দার প্যাটেলকে কুপোকাৎ করে ফেলেছেন। তাঁর তূণীরে ছিল তিনটে যুক্তির অমোঘ তীর। প্রথমত, তিনি প্যালেটকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, অনেক আগেই পাঞ্জাব দাঙ্গায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই ওই রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করতে চেয়েছেন এবং প্যাটেলের আগ্রহ ও উদ্যোগেই কংগ্রেস এই বিষয়ে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করছিল (প্রস্তাবটা নেওয়া হয়েছিল যখন গান্ধীজী বিহারে এবং মৌলানা আজাদ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন)। বড়লাট সেই প্রসঙ্গ তুলে প্যাটেলকে বলেছেন। সুতরাং বলা যায় যে, প্যাটেল নীতিগতভাবে দেশভাগের বিরোধী। বরং বলা চলে--- সেই প্রস্তাবটাকেই সাম্প্রসারিত আকারে ভারত ভাগে পরিণত করলে সমস্যাটা মিটে যাবে। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারে লীগ ও কংগ্রেসের মন্ত্রীরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী অর্থবরাদ্দ বন্ধ করে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সব দপ্তরই অচল করে রেখেছিলেন। বড়লাট প্যাটেলকে সেই মনে করে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, দেশকে ভাগ না করলে এমনটাই ঘটবে সব ব্যাপারে। তৃতীয়ত, তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে, একটা যৌথ পরিবারে গণ্ডগোল দেখা দিলে নিত্য কলহকে পরিহার করার জন্য সদস্যদের পৃথক করে দেওয়াই ভালো। দেশটা বিভক্ত হলে কংগ্রেস বৃহত্তর অংশকে তার ইচ্ছেমতো গড়ে তুলতে পারে। এটিই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।

এরপর সর্দার প্যাটেল যুদ্ধ-বিধবস্ত সেনাপতির মতো বেরিয়ে এসেছেন। বড়লাট তখনই বুঝেছেন কেল্লা ফতে। প্যাটেলকে শক্তপোক্ত নেতা বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ভেতরটা একেবারে ফাঁপা। লিওনার্ড মস্‌লে লিখেছেন, প্যাটেল চলে গেলেই বড়লাট উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠেছেন---'It worked. He seemed to be such a hard nut. Yet I once cracked the shell he was all pulp inside---'(দ্য লাস্ট ডেজ অফ দ্য ব্রিটিশ রাজ, পৃ.১৯০)।

সুতরাং বলা চলে, কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে প্যাটেলই সর্বপ্রথম মাউন্টব্যাটেনের ফাঁদে পা দিয়েছেন। মৌলানা আজাদ লিখেছেন, 'It must be pleased on record that the man in India who first feel for Lord Mountbatten's idea was Sardar Patel.' (ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম, পৃ.১৯৭)। শুধু তাই নয়, এরপর প্যাটেলের প্রথম কাজ হয়ে উঠেছিল অন্যান্য নেতাদের পাকিস্তান প্রস্তাবের দিকে টেনে আনা। সত্যিই যেন বড়লাট তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছিলেন (কে. এন. পাঞ্জাবী, ড্য ইনডমিটেবল্ সর্দার, পৃ. ১২২-২৬)।

আজাদ লিখেছেন, মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সেই বৈঠকের পর প্যাটেল রুদ্ধ দ্বার কক্ষে গান্ধীজীর সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক কথা বলেছেন এবং তার ফলে আজাদের জীবনে ঘটেছে চরমতম দুঃখের ঘটনা---ইতিমধ্যে গান্ধীজীও বদলে গেছেন এবং তিনিই দেশভাগের পক্ষে কথা বলতে শুরু করেছেন প্যাটেলের কণ্ঠেই। নেহরুকেও কিছুটা প্রভাবিত করেছেন, যদিও এই ব্যাপারে আরও বড় ভূমিকা নিয়েছেন লর্ড ও লেডী মাউন্টব্যাটেন---(ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য---ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ.২৯০)।

এরপর যখন কংগ্রেসের অধিবেশনে বিষয়টা উঠেছে, প্যাটেল দেশবিভাগের পক্ষেই সওয়াল করেছেন এবং ভোটও দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল---দেশভাগের প্রস্তাব মেনে না নিলে পুরো দেশটাই পাকিস্তান হয়ে যাবে---(ভি. প্রভাকর সর্দার প্যাটেল, পৃ.৬৩)।

এইসব কারণেই বলা যায়, দেশভাগের ব্যাপারে প্যাটেলের ভূমিকাকে লঘু করে দেখাটা হবে ইতিহাসের অবমাননা। তিনি পাঞ্জাব ভাগের উদ্যোগ নিয়ে বড়লাটের কাজটার গোড়াপত্তন করেছেন এবং পরে বড়লাটের প্রয়াসটাকে কার্যকর করার ব্যাপারেও অগ্রণী হয়েছেন। তাছাড়া এই ব্যাপারে তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। তিনি আগে একবার কংগ্রেস ত্যাগ করবেন। কিন্তু তিনি আমৃত্যু ছিলেন কংগ্রেসী মন্ত্রী (পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, আমাদের সর্দার প্যাটেল, পৃ.৯৩)।

সুতরাং দেশভাগ জনিত পাপকার্যের তিনিও ছিলেন অন্যতম প্রধান অপরাধী। আসলে, তাঁর তখন বয়স ছিল ৭২, তিনি জানতেন সময় বেশি নেই। তাই তিনিও জিন্না ও নেহরুর মতো ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, সেই সুযোগ তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল মাত্র তিন পুত্রের জন্য।

নেতাদের ব্যক্তিগত লোভ ও লালসাই সেদিন ভারতবর্ষের সর্বনাশ ঘটিয়েছিল।

*(৩১.১০.০৯---সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৩৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)*

# হিন্দু ধর্ম বুঝতে সংস্কৃত জানতে হবে — অমলেন্দু দে

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল মহাপুরুষ অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন, তাঁরা সকলেই হিন্দুধর্মের গভীরতা উপলব্ধি করেছিলেন সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই। আজ যখন ছোট ছোট তরুণ-কিশোরদের মুখে এই ভাষার চর্চা শুনতে পাই তখন ভবিষ্যতের আশার পথ দেখতে পাই"— এই মন্তব্য করলেন ঐতিহাসিক তথা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সচিব অধ্যাপক অমলেন্দু দে। গত ৩১ অক্টোবর কলকাতা শেক্সপীয়ার সরণীস্থিত অরবিন্দ ভবনে অনুষ্ঠিত সংস্কৃত ভারতীর দশদিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের সমারোপ কার্যক্রমে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখতে এসে তিনি এই মন্তব্য করেন।

প্রসঙ্গত গত ৩১ অক্টোবর ছিল সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ শাখার দশদিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। বিকাল ৩টায় কার্যক্রমের সূচনা হয়। কার্যক্রমে নৃসিংহচরণ পণ্ডা বলেন, স্বাধীন ভারতে সংস্কৃত ভাষাকে পরিকল্পিতভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিমান-প্রযুক্তি থেকে দৈনন্দিন জীবনের সর্বস্তরে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভের ব্যবস্থা রয়েছে। ভরদ্বাজ মুনির বৈমানিক শাস্ত্র, বরাহমিহিরের জ্যোতিষশাস্ত্র তথা জ্যোতির্বিদ্যা, ভাস্করাচার্যের ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি মূল্যবান তত্ত্ব সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত।

যে দশটি স্থানে গত ২১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতাতে শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে; সেগুলি হল, আদ্যাপীঠ, অরবিন্দ ভবন, ২৬ নং বিধান সরণী, গীতাদেবী সরস্বতী শিশু মন্দির, সংস্কৃত সদনম্ - সল্ট লেক, শরণ্য মাতৃসেবাশ্রম সঙ্ঘ, সূরজবালা চতুষ্পাঠী, হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ---বালিগঞ্জ। প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে এই শিবির চলেছে। ছাত্র-ছাত্রী মিলে প্রায় আড়াইশো জন এই দশদিন সংস্কৃতে কথা বলার অভ্যাস আয়ত্ত করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিনায়ক সমাদ্দার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

*সংস্কৃত ভারতী-র সমারোপ অনুষ্ঠানে অমলেন্দু দে (মাঝে), নৃসিংহ চরণ পণ্ডা ও বিনায়ক সমাদ্দার চৌধুরী। ছবি ঃ মৌমিতা বসু*

# কংগ্রেসের বাম-বিরোধিতার বেলুন ফাঁস

*(১ পাতার পর)*

শ্লোগান দিয়ে জ্যোতিবাবু রাজ্যের কংগ্রেস সমর্থকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন বিপদের দিনে তাঁরা পার্টির পাশে এসে দাঁড়ান।

অর্থাৎ জ্যোতিবাবুর ঝুলি থেকে কালো বিড়ালটি অবশেষে বেরিয়ে এল। জ্যোতিবাবুই জানিয়ে দিলেন যে, ১৯৭৭ সাল থেকেই রাজ্যের তরমুজ কংগ্রেস নেতারা গোপনে সিপিএমকে সাহায্য করছেন। অতীতে এই অভিযোগেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস দল ত্যাগ করেন। রাজ্য কংগ্রেসকে সি পি এমের 'বি-টিম' বলতেন প্রকাশ্যেই। নেত্রী এখন স্রেফ গদি দখলের লোভে সেই সি পি এমের তল্পিবাহক রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন। কোনও নীতির বালাই তিনি রাখেননি। সি পি এম তাঁর রাজনৈতিক শত্রু। কিন্তু পার্টির তল্পিবাহক দল তাঁর জোটসঙ্গী। এমন জোটসঙ্গী যারা প্রকাশ্যে মমতার বাপ-বাপান্ত করে। রাজ্য কংগ্রেসে আজ এমন একজন নেতাও নেই যে মমতা এবং তাঁর দল তৃণমূলকে বন্ধু দল মনে করে। কেন্দ্রীয় রাজনীতির বাধ্যবাধকতা রাজ্য কংগ্রেসকে তৃণমূলের জোটসঙ্গী করেছে। সি পি এম বিরোধিতা অথবা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থে নয়। এই কথাটা অজানা নয় মমতার। তাই তিনি প্রায়ই বলেন রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্গে আসল রফা হয়েছে বাম বিরোধী ভোট বিভাজন রুখতে। কোনও জোট হয়নি।

সি পি এম কৌশলী পার্টি। বিরোধী জোটে সে অনেক ঘোঁট আছে তা বুঝেই বুদ্ধ-বিমানরা অতি বৃদ্ধ জ্যোতি বসুকে শিখণ্ডী খাড়া করেছেন। আলিমুদ্দিনের রথী-মহারথীরা সাংবাদিক বৈঠক ডেকে কংগ্রসেকে বন্ধু দল ঘোষণা করলে হিতে বিপরীত হতো। এখন দক্ষিণবঙ্গে কংগ্রেস অস্তিত্বহীন দল। আলিমুদ্দিন থেকে কংগ্রেসকে পার্টির পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানালে রাজ্য থেকেই কংগ্রেস মুছে যেত। রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতেন মমতা এবং তাঁর দল। তাই পার্টির আবেদনটি জ্যোতিবাবুকে লিখে দেওয়া হয়। তিনি পড়ে শোনান। মমতা নানা ছুতো-নাতায় জ্যোতিবাবুকে প্রণাম করতে সল্ট লেকে ইন্দিরা ভবনে যান। তাঁর সেই প্রণম্য জ্যোতিবাবুর বয়ানকে তিনি কীভাবে কটাক্ষ করবেন? সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। গিলতেও পারা যায় না, ওগরাতেও পারা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই মমতা তাই জ্যোতিবাবুর আবেদনের বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছেন। প্রতিক্রিয়া দেননি।

প্রশ্নটি ঠিক এখানেই। এ কেমন বিরোধী নেত্রী? এ কেমন বাম বিরোধী জোট? সি পি এম রাজনৈতিক শত্রু দল। কিন্তু এই দলেরই নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বন্ধু ও শ্রদ্ধেয়। এ কেমন বাম বিরোধী জোট? সি পি এম ছাড়া অন্যসব বামদল বন্ধু। তাদের জন্য তৃণমূলের দরজা সর্বদাই খোলা। এমনকী হিংসাশ্রয়ী মাওবাদীরাও স্বাগত। শুধু মার্কসবাদীরাই শত্রু। যদি বলি ক্ষমতা দখলের জন্যই কংগ্রেস-তৃণমূল নীতিহীন জোট বা আসন রফা করেছে তা হল কী ভুল হবে। এই জোটের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

যদি আগামী বিধানসভার নির্বাচনে এই জোট শাসন ক্ষমতায় আসে তবে সেই জোট সরকার কতটা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সরকার চালাবে? রাজ্য কংগ্রেস নেতারা সরকার পরিচালনায় 'দিদিগিরি' বরদাস্ত করবে না। তা যতই বাধ্যবাধকতা থাকুক না কেন। তাই ভোটদাতাদের ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে পশ্চিমবঙ্গে যথার্থ বাম বিরোধী দল কোনটি। যে দলের নেতারা ইন্দিরা ভবনে জ্যোতিবাবুর পায়ে পড়েন না। কেন্দ্রে সি পি এম বন্ধু, রাজ্যে শত্রু দল বলেন না। এবং কোন দলকে সি পি এম-মাওবাদী সব জাতের কম্যুনিস্টরা ভয় পায়। বেছে নিন তেমন একটি দলকে।

## নগ্ন মুসলিম তোষণ

*(১ পাতার পর)*

রাজনীতি। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বও এই আক্রমণের ঘটনাগুলি নিয়ে নির্বাক। মুসলমানদের পদলেহন করবার জন্য সিপিএম এবং তৃণমূলের জোর প্রতিযোগিতা চলছে।

রাজ্যের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী এসবের কড়া নজরদারি রাখছে। তার প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক। রামপুরহাটের বিধায়ক আশিস ব্যানার্জি এর শিক্ষা পেয়েছেন। মুসলিমরা হিন্দুদের আক্রমণ করলেও তিনি আক্রমণকারীদের পক্ষ নিয়েছিলেন। জনতা তার বাড়ি ও অফিস ভাঙচুর করে। তিনি পালিয়ে বাঁচেন। তোষামুদে নেতাদের জন্য সতর্কবার্তা।

# চাই গোশালা ও গো-চারণ ভূমি

*(১ পাতার পর)*

বলেন, কলকাতা ঘুরে রাস্তাঘাটে একটি গোরুও তাঁর চোখে পড়েনি। শুধু কলকাতাতেই নয়; দিল্লী, মুম্বাইয়ের মতো মেট্রো শহরেও এই ধরনের অভিজ্ঞতার সাক্ষী তোগাড়িয়া। যার সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শহরের ফ্ল্যাটে গোরু রাখার জায়গা নেই। কিন্তু গ্রামে গোরুর 'ডিমাণ্ড' যথেষ্ট। অথচ গ্রামের লোকই তো বেচে দিচ্ছে গোরু। এবার মোক্ষম জবাব দিলেন প্রবীণভাই — "আমাদের এই সত্যটা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, একটা দুধেল গোরু কখনোই অর্থনীতির দিক দিয়ে 'ভাইয়াবেল' নয়। কারণ, দুধেল গাইকে খাওয়ানোর খরচ প্রতিদিনের হিসেবে দাঁড়াচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। সেক্ষেত্রে গোরু দিনে দুধ দিচ্ছে প্রায় চার লিটার। কিন্তু বছরে মাত্র তিনমাস দুধ দেয় গোরুটি। গোরুর এই খাই-খরচা দেখেই তাকে বেচতে বাধ্য হচ্ছে কৃষক। কিন্তু গোরুর খাই-খরচা কৃষককে যোগাতে হবে কেন? এত গো-চারণভূমি গেল কোথায়? গো-চারণভূমি থাকলে তো গোরুর খাবারের অভাব হওয়ার কথা নয়।"

তাঁর ইঙ্গিতটা ধরতে পারল উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী। গো-চারণভূমি নষ্ট করেই কলকাতার বুকে গড়ে উঠেছে অজস্র ফ্ল্যাট। বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে গোরু। যে কারণে ওই সভার অন্যতম বক্তা পরমার্থ সাধক সঙ্ঘের বিষ্ণুপুরীজী মহারাজ খেদের সঙ্গে বললেন, "এরাজ্যে কুমীর, বাঘ পোষার জন্য অভয়ারণ্যের প্রয়োজন হয়, কিন্তু যে গোরুর দুধ সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তার জন্য এরা (পড়ুন রাজ্য সরকার ও বিরোধীরা) কিছুই করেনি।" অযোধ্যার রামবিলাস বেদান্তী মহারাজ আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, "কলকাতায় যে যেখানে গোরুকে দেখবে, অমনি তাকে কসাইখানায় পাঠাবে।" যার মোক্ষম দাওয়াই দিয়ে প্রবীণভাই কৃষককে সচেতন করার পাশাপাশি গো-চারণভূমি বাড়িয়ে দুধেল গাইকে 'ইকনমিক্যালি ভাইয়াবেল' করে তোলার কথা বলেন। প্রবীণভাইয়ের এ বিষয়ে স্পষ্ট মত, "কৃষকরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গোরু বেচেন না। পরিস্থিতি তাদের গোরু বেচতে বাধ্য করে। ১৯৫০ সালের আগে এদেশে যত গো-চারণভূমি ছিল আজ তা কোথায় গেল?" রামবিলাস বেদান্তীর হিসেব— "দেশভাগের আগে এদেশের পশুর সংখ্যা ছিল ৮০ কোটি, আজ তা ২০ কোটিতে নেমে গেল কি করে?" তাঁর আক্ষেপ— "এদেশে গোরু নিধনের ট্রাডিশন ঔরঙ্গজেব থেকে ইংরেজ এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত সমানে চলেছে।" শ্রীতোগাড়িয়া বলেন, "শহুরে মানুষ প্রতিদিন এক টাকা করে দিন, একটা দুধেল গোরুও মরবে না। সমৃদ্ধ করুন গো-শালা। চার লিটারের পরিবর্তে দশ লিটার দুধ পাবেন।" বক্তৃতার এইসব আমেজই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে কলকাতা। এছাড়াও মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুরুষোত্তম লাল ভুত, গোপাল ধূয়ালিয়া, নন্দলাল সিংহানিয়া, উমা সরাফ, অশোক ভারুকা, জীবনলাল বাহেতি প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জন্মসূত্রে এক নেপালী তনয়া। নাম শোভা মারদা।

## রামলীলা ময়দানে মোহন ভাগবত

*(১ পাতার পর)*

যদি আপনার বছর দুয়েক পরে মনে হয় যে মোহনরাও ভাগবত যা বলেছেন তা ঠিক নয় তবে আপনারা চলে যেতে পারেন।'

প্রতিবেশি দেশ সম্পর্কে শ্রীভাগবতের বক্তব্য, "আমরা কারুকে দংশন করার পক্ষপাতী নই। কিন্তু ন্যূনতম ফণা তোলবার অধিকারটুকু আমাদের নিশ্চয়ই আছে। ভারতের প্রতিবেশিদের মধ্যে চীন ক্রমশ তার প্রভাব বৃদ্ধি করছে। আমাদের এখনই উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এনিয়ে একটা উদ্বেগ থাকা অবশ্যই দরকার।" পাকিস্তান প্রসঙ্গে ভাগবতের পরামর্শ, তাদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু আলোচনা তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন ভারত ধরতে পারবে বিপক্ষের মাথায় কি ধরনের কূটনীতি রয়েছে এবং সেইমতো এদেশকে অগ্রসর হতে হবে।

মোহনজীর সেদিনের বক্তব্য আগাগোড়া হিন্দুত্ব, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং এই বিষয়গুলিতে আর এস এস-এর ভূমিকা এই সুরেই বাঁধা ছিল।

রাজ্য রাজনীতি

# রাজ্যে যুযুধান সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান হোক

**নিশাকর সোম**

এরাজ্যে এখন চলেছে অবরোধ, সন্ত্রাস, হত্যার রাজনীতির হিড়িক। সে কথায় যাবার আগে; সি পি এম নেতা বাগাড়ম্বরকারী অনিল বসুর উক্তি সমগ্র নারী সমাজের ক্রোধ এবং ঘৃণার উদ্রেক করবে। এ কথাটা সেই কটুভাষী অনিল বসু ওরফে মানিক রায় জানেন না।

এরপর উল্লেখ্য ঘটনা হল, রাজধানী এক্সপ্রেসকে পণবন্দী করল জনগণের কমিটি অর্থাৎ মাওবাদীদের প্রকাশ্য সংগঠন। ঘটনা ঘটল ঝাড়গ্রামের নিকটে বাঁশতলা স্টেশনে। জঙ্গিরা ট্রেন থেকে ট্রেনের চালক এবং সহ চালককে নামিয়ে আটক করে। ট্রেনের ওপর ইঁট ছুঁড়ে মারার দরুণ ভাঁঙা কাঁচের আঘাতে একজন যাত্রীর চোখে আঘাত লাগে। জঙ্গিদের দাবী ছিল— এক, ছত্রধর মাহাতোর মুক্তি, দুই, যৌথ বাহিনী প্রত্যাহার।

মুখ্যমন্ত্রী এই দাবী না মেনে যৌথ বাহিনীকে ঘটনাস্থলে পাঠানোর নির্দেশ দেন। বস্তুত, যৌথবাহিনীর অভিযানে ট্রেনটি বেশ কয়েকঘন্টা পরে মুক্ত হয়। তেমনি বেশ কয়েক ঘন্টা পরে রিলিফ ট্রেন, প্যান্ট্রিকার ও মেডিকেল ট্রেন যায় ঘটনাস্থলে। এক দুঃসহ যন্ত্রণা, উদ্বেগ, আতঙ্কে যাত্রীরা কয়েকঘন্টার এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটান।

ঠিক এই ঘটনার সময়ে রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী অপহৃত পুলিশ কর্মীদের আত্মীয়দের নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দরবার করে পরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "এই ঘটনার পিছনে সি পি এমের হাত আছে।" আরও মজার কথা, আর একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী বলেন— তিনি ঘটনার আগেরদিনই জানতেন এরকম ঘটনা ঘটবে। ঘটনার পরদিন এক তৃণমূলের সাংসদের পত্রিকায় লেখা হয়— মমতার কথায় জঙ্গিরা ট্রেনটি ছেড়ে দেয়।

এই সমস্ত সংবাদ আগেই পাঠকগণ পড়েছেন। ভাবুন, আমরা কোথায় আছি! একজন মন্ত্রী জানলেন এরকম ঘটনা ঘটবে, তবুও তিনি নিবারণের জন্য কোনও উদ্যোগই নিলেন না! কেন? এরপরও সেই মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী অথবা ইউ পি এ

*অনিল বসু*

চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী কি কিছু বলেছেন? পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে, মমতার সঙ্গে মাওবাদীদের কোনও সংস্রব নেই। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র বলেছেন— এতেই তো পরিষ্কার কে, কেন এসব কথা বলছেন।

আসলে এরাজ্যে সি পি এম এবং তৃণমূল দুই দলই রাজ্যের মানুষের শান্তি, স্বস্তি মঙ্গলের কথা ভাবছে না, ভাবছে শুধু ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ। এই দুই যুযুধান দলের থেকে পৃথক শান্তি স্থাপনে আগ্রহী দলকে এগিয়ে আসতে হবে।

উল্লেখ্য, এই ঘটনায় মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী কোনও বিবৃতি দেননি। ওদিকে আর এস পি বিভিন্ন নকশাল গোষ্ঠীকে নিয়ে এক কনভেনশন করার পথে চলেছে।

সি পি এমের পার্টির নিচের তলার কর্মীদের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে। গরম গরম কটু কথা বলে এদের উৎসাহী করার ভ্রান্ত চেষ্টা করা হচ্ছে। উপরন্তু নিচের তলার কর্মীদের মধ্যে নেতৃত্ব সম্পর্কে আরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। যার প্রতিফলন ঘটবে বিধানসভার উপনির্বাচনে। বোধকরি ১০টি কেন্দ্রেই সি পি এম পরাজিত হবে।

> **"এরাজ্যে সি পি এম এবং তৃণমূল দুই দলই রাজ্যের মানুষের শান্তি, স্বস্তি মঙ্গলের কথা ভাবছে না, ভাবছে শুধু ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ।"**

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, প্রাথমিক শিক্ষকদের কাজের জন্য লক্ষ লক্ষ ফর্ম বিলি হয়েছে। এরা যদি পরীক্ষায় বসার সুযোগ না পায় তার ফল হবে ভয়ানক। প্রাথমিক চাকরির সেই ঘোষণা ব্যুমেরাং হবে না তো!

রাজ্যের ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক দলের অবলুপ্তি ঘটল। মধ্য কলকাতার ছোড়দা, যিনি তৃণমূলের সাংসদ (ডায়মণ্ডহারবার), তিনি ও তাঁর গোষ্ঠী প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেসকে তৃণমূলে বিলীন করে দিলেন। এটি কংগ্রেস কর্মীদের তৃণমূলে আসার চাপ মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অবলুপ্তির জন্য কংগ্রেসিদের মধ্যে চোরাস্রোত আছে।

সি পি এমের মধ্যে একাংশের (নেতা সমেত) তৃণমূলী মনোভাব আছে। শোনা যাচ্ছে, সি পি এমের একাধিক নেতা ২০১১ সালের পর পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে সম্পত্তি করছেন। শোনা যায়, কেন্দ্রীয় নেতাদের পৃষ্ঠপোষিত এক নেতা রাজস্থানে সম্পত্তি কিনে ফেলেছেন। পার্টিতে শুদ্ধি চলবে! এসব খোঁজখবর কি সি পি এমের কেন্দ্রীয় নেতারা নেবেন?

সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ, রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী মতুয়া সম্প্রদায়ের সংস্থার

*শিশির অধিকারী*

সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। এটা কি তবে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধে— শুধু ভোট সংগ্রহের চাল!

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, তৃণমূল নেতা, যিনি তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গড়ার স্থপতি তাঁকে বর্তমানে কোণঠাসা করে তাঁর স্থানে নকশালী পূর্ণেন্দু বসুকে ট্রেড ইউনিয়নের ভার দিয়েছেন মমতা। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে মমতা ব্যানার্জী নিজের কাছের লোকেদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক চক্র তৈরি করতে চলেছেন। মমতার আশা, ক্ষমতার লোভে মনোনয়নের জন্য রাজ্য কংগ্রেসে বড় ধরনের ভাঙন ধরবে। ছোড়দা তো আগেভাগেই সাংসদ হয়ে নিজের শেষ জীবনটা গুছিয়ে নিয়েছেন। সি পি এমের প্রায় সব নেতাই আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। মরলে মরবে নিচের তলার কর্মীরা। ধন্য রাজনীতি! 'আমরা খাবো, তোমরা বাদ'— এই নীতিই চলছে সি পি এমে।

শোনা যাচ্ছে সি পি এম নেতৃত্ব ঠিক করেছেন, তারা তৃণমূলের পাল্টা— তৃণমূলের কায়দায় রাজ্যে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। এর ফলে কেন্দ্র রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করবে। সি পি এম 'শহীদ' হয়ে জনগণের সহানুভূতি কুড়ানোর চেষ্টা করবে।

বর্তমানে প্রয়োজন রাজ্যে শান্তির উন্নয়ণের দাবী নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা। এর সংগঠন কোথায়! এই দাবীতে যত ধরনের সংগঠন-ব্যক্তিকে জড়ো করাটাই আজকের প্রধান কাজ। শুধু নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক সমালোচনা দরকার। সি পি এম ২০১১ সালের পর সম্পূর্ণরূপে বিকল হয়ে যাবে।

অন্য রকম

# উকিলবাবু

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** মহেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা তাঁর ওকালতির জীবনে শুধু 'সাচ কা সামনা'র জন্য লড়ে গেছেন। কখনও নিজের জন্য ভাবেননি। ভাবেননি ভুরি ভুরি মামলা লড়ে টাকা উপার্জনের কথাও। নিজের ওকালতি বিদ্যার ষোলোআনা ঢেলেছেন জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থে।

কি করেন মহেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা? ৫৫ বছর বয়সী মহেন্দ্রপ্রসাদ পাটনা হাইকোর্টের আইনজীবী। আইনজীবী হয়েও তিনি কখনও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে মামলা লড়েননি। উল্টে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র মতো শুধু জনস্বার্থের মামলাগুলিই লড়েছেন। কখনও অন্য মামলায় পা বাড়াননি। কোর্টের ফাইল চাপা থাকা জনস্বার্থ মামলাগুলিকেই ফাইল থেকে বের করে শুনানির ব্যবস্থার করেন তিনি। এজন্য দিন-রাত পরিশ্রমও কম করেন না। খুঁজে খুঁজে বের করেন জনস্বার্থ বিষয়ক মামলাগুলি। জনগণের হয়ে জনগণেরই আইনকে কাজ লাগানোর স্বপ্ন দেখেছেন মহেন্দ্রবাবু। দোষী পুলিশ অফিসার থেকে পৌরসভার কর্মীকে শাস্তি দিতে মহেন্দ্র কখনও ভয় পাননি। তাবড় তাবড় নেতার মামলা আদালতে তুলে সাজার ব্যবস্থা করেছেন মহেন্দ্র। সরকারি আমলারাও মহেন্দ্রবাবুকে দেখলে ভয় পান। কখন কোন দোষীর সাজার জন্য উঠেপড়ে লাগবেন মহেন্দ্রবাবু, তা তাঁর নিকট আত্মীয়রাও টের পান না।

*পাটনা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে মহেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্তা।*

মহেন্দ্রবাবু তাঁর ওকালতি জীবনে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা লড়াকেই ধ্যান-জ্ঞান করেছেন। জীবনে ৬০০ পুলিশ কর্মীকে নিজের উদ্যোগে সাজা দিয়েছেন। ৫৮ হাজার পলাতকের মামলা চালু করে সাজার ব্যবস্থা করেছেন। এই তালিকায় বাদ নেই সরকারি আমলা থেকে আঞ্চলিক নেতা-কর্মীরাও।

সরকারি প্যানেলে মহেন্দ্রবাবুর ঠাঁই না হলেও তিনি দুঃখিত নন। বরং জনগণের হয়ে লড়াতেই তিনি আনন্দ পান। মহেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তার পারিবারিক জীবনও বেশ সুখের। হয়তো অন্যকে সুখী রাখা মহেন্দ্রকে দুঃখী দেখতে চান না ভগবানও।

## যেখানে প্রচার সেখানেই হার

# সাধের বামজোট ভেঙ্গে চুরমার মহারাষ্ট্রে

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** আবারও ডাহা ফেল সি পি এম। ফেল সি পি এমের সাধের তৃতীয় ফ্রন্টও। সেই স্বপ্নের গুড়ে আপাতত বালি পড়েছে। লোকসভা ভোটে ব্যাপক ঠ্যাঙ্গানির পর এবার মহারাষ্ট্র ভোটে কিছু করে দেখাতে 'পড়ি কি মরি' করে ছুটেছিলেন প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরি, বৃন্দা কারাত, মানিক সরকাররা। কিন্তু দেখা গেল, মহারাষ্ট্রে ১৭টি দলকে নিয়ে গড়া জোটের প্রায় সলিল সমাধি ঘটল নির্বাচনে। এই জোটের শখ করে নাম দিয়েছিলেন প্রকাশ কারাতরা 'রিপাবলিকান লেফ্‌ট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (আর এল ডি এফ)। মাত্র তেরটি আসন পেয়ে দৌড় শেষ করেছে এই জোট। এই জোটের হোতা সি পি এমের আসন বরং কমে ৩ থেকে ১-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এক বিধায়ক কোনওক্রমে নিজের আসনটি দখলে রাখতে পেরেছেন। মহারাষ্ট্রে প্রচারে ঝড় তুলতে এবার দিল্লী থেকে সি পি এমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরি, বৃন্দা কারাত, এম কে পান্ধেরা ছুটে গিয়েছিলেন। ত্রিপুরা থেকে সুদূর মহারাষ্ট্রে প্রচারে ছুটে গিয়েছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ও পলিটব্যুরোর অন্যতম সদস্য মানিক সরকারও। মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সে রাজ্যের কংগ্রেস-এনসিপি জোট সরকারকে যোগ্য জবাব দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহারাষ্ট্রে প্রচারে যান নাসিক জেলার বোরগাঁও-এ। উপজাতি ও কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলে সি পি এম প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়েছিল জে পি গাভিটকে। তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন এন সি পি প্রার্থী এ টি পাওয়ার।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী গত ৮ অক্টোবর এই অঞ্চলে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণ শুনতে ভালো ভিড়ও হয়ছিল। মানিক সরকার তাঁর ভাষণে আরও বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার এই এলাকারই লোক। অথচ এখানেই কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। ভোটে তার জবাব চাইবে জনগণ। এছাড়া তৃতীয় ফ্রন্ট আর এল ডি এফ-এর শক্তি বাড়াতেও তিনি মহারাষ্ট্রবাসীর প্রতি আবেদন জানান। উল্লেখ্য, মানিকবাবু গত ৭ অক্টোবর থেকে ৩ দিনের জন্য মহারাষ্ট্রে ভোট-প্রচারে গিয়েছিলেন। ভোটের ফলাফলে দেখা গেল, উল্টে সি পি এমের আসন কমে গিয়েছে। ছিল ৩টি, হয়েছে ১টি। সি পি এমের অপর বাম শরিক সি পি আই ২০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে একটি আসনেও জিততে পারেনি।

শুধু তাই নয়, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার গত ৭ অক্টোবর মুম্বাইয়ের আন্ধেরি ইস্টে ও সি পি এম প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহম্মদ সেলিমের সমর্থনে একটি জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। এরপর শ্রীসরকার ভাষণ দিয়েছেন নাসিকের কন্বনে। এখানে সি পি এমের প্রার্থী ছিলেন জিভা পাণ্ডু। এমনকি মুখমন্ত্রী মানিক সরকার তাঁর পার্টির হয়ে প্রচার চালাতে গিয়েছিলেন শোলাপুরে। এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধের কন্যা প্রণিতি সিন্ধে। এখানে সি পি এমর প্রার্থী ছিলেন নারসাইয়্যা আদম ওরফে আদম মাস্টার। তিনিও হেরে ভূত হয়েছেন।

অর্থাৎ দেখা গেছে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারসহ দলের শীর্ষ নেতারা যেখানে যেখানে ভোট প্রচারে গেছেন সেখানেই দল ডুবেছে। অন্যদিকে উল্লেখ্য, এর আগে গত লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে, তামিলনাড়ুতে দলের

*কারাত-ইয়েচুরির যুগলবন্দী বাঁচাতে পারল না জোটকে।*

প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন। দেখা গেছে, ৯৯ শতাংশ আসনে দল ডুবেছে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে সি পি এম, সি পি আইয়ের এমন অবস্থা যে বেশির ভাগ আসনেই দলকে জমানত খোয়াতে হয়েছে। সি পি এমের একমাত্র সলতে হচ্ছেন রাজারাম ওজারে। তিনি ডাহানু আসন থেকে জয়ী হয়েছেন।

সি পি এম মহারাষ্ট্রে আর এল ডি এফ গড়ে নির্বাচনে পরিবর্তনের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিল। উল্টে দেখা গেল, প্রধান হোতা সি পি এমের ২টি আসন কমে গেল। আরও একবার ধাক্কা খেল সি পি এমের সাধের বিকল্প জোট। শুধু ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারই নয়, মহারাষ্ট্রের শোলাপুর, কোলাপুর, থানে জেলার ইজ্জতপুরি, দিন্দোরি, নাসিক, পুনে, রামটেক, দেভরিতে ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি থেকে বৃন্দা কারাত, এম কে পান্ধে, সুভাষিণী আলি, প্রকাশ কারাতরা। রামটেকে তো এমন অবস্থা, যেখানে সি পি এম, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক নিজেদের মধ্যে লড়েছে। ফলত জামানত জব্দ তিন দলের প্রার্থীরই।

# টাকা যার বিদ্যা তার— বুঝিয়ে দিল ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার

**সংবাদদাতা।।** শোষণহীন সমাজ গড়া ও আর্থিক বৈষম্য দূর করে পশ্চাদ্‌পদ জনগণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া— এই চেতনায় যারা বিশ্বাসী, তাদের রাজত্বে ত্রিপুরায় উচ্চশিক্ষা এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে। যার জন্য মেধাবী থাকা সত্ত্বেও ২৭ জন ছাত্র স্রেফ গরীবের সন্তান হওয়ায় ডাক্তারী পড়তে পারল না। তাও কোনও

*মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার*

কোম্পানী বা বাণিজ্যিক সংস্থার গঠিত মেডিকেল কলেজে নয়। রাজ্য সরকারের একটি সোসাইটি পরিচালিত মেডিকেল কলেজে। একমাত্র আর্থিক যোগ্যতার কারণে র‍্যাঙ্ক বহির্ভূত ছাত্ররা ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেল। গরীব ছাত্রদের নিয়ে শ্রমিক কৃষক সরকারের এই অভিনব চাটুকারিতায় বিস্মিত রাজ্যবাসী। শাসক দলের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই কিংবা এন এস ইউ আই এই বিষয়ে নিশ্চুপ।

আম্বেদকর হাসপাতালে জমি থেকে যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে সরকারি টাকায়। আমলা-নেতাদের বেসরকারিকরণের জোয়ারের ঠেলায় হাপানিয়া সরকারি হাসপাতাল চলে যায় এক কর্পোরেট হাউসের কাছে। জনগণের ট্যাক্সে হওয়া হাসপাতাল পেয়ে জিনেট কয়েকশ কোটি টাকা কামিয়ে রাজ্য ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে। প্রশাসনিক ব্যর্থতায় অপকর্মের দুর্গন্ধ ঢাকতে সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে সোসাইটি গঠিত হয় ১৯৭৪ অ্যাক্ট ও রুলের মাধ্যমে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে কোনও প্রতিষ্ঠান চালানো মানেই প্রশাসনিক খরচ কম হবে, ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেতন কম হবে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের থেকে সাড়ে তিনগুণ ফি বেশি প্রথম বছরের ছাত্রদের ভর্তির ক্ষেত্রে। সঙ্গে রয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কশান মানি এবং চবিবশ হাজার টাকা হোস্টেলের খরচ। অর্থাৎ বছরে দাঁড়ায় চার লাখ নয় হাজার টাকা। আগামী বছর না কি এই খরচ আরও বাড়বে সর্বক্ষেত্রে। তাহলে সরকারি সোসাইটি করার অর্থ কি ছিল?

এর মধ্যে যারা ভর্তি হয়েছে নিশ্চিতরূপে অভিভাবককে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে পড়াতে হচ্ছে। হিসাবে দেখা গেছে, সোসাইটি পরিচালিত মেডিকেল কলেজে পড়াতে একজন ছাত্রের জন্য অভিভাবককে আঠার থেকে কুড়ি লাখ টাকা খরচ করতে হবে। পাঁচ বছরে ব্যাঙ্কের সুদসহ তা দাঁড়াবে ত্রিশ থেকে বত্রিশ লাখ টাকা। কিন্তু সোসাইটি কলেজ থেকে একজন ছাত্র ডাক্তারী পড়ে এসে ব্যাঙ্ক ঋণসহ ত্রিশ-বত্রিশ লাখ টাকা খরচ হবে। সেই হিসাবে পাঁচ বছর পর একজন ডাক্তারের বেতন পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি হবে না। তার বেতন চলে যাবে ব্যাঙ্কের সুদ দিতেই। ফলে এক একজন ডাক্তার নিজের অজান্তেই কসাইখানা তৈরি করে ফেলবে। প্রশ্ন উঠেছে, এই রাজ্যে চবিবশটি আধা সরকারি সংস্থা রয়েছে। সব কয়টি লোকসানের বহর গুণছে বছরের পর বছর ধরে। সরকার তাদের অনুদান দিয়ে যাচ্ছেন। অথচ যে কলেজ থেকে আগামী দিনে ডাক্তার বের হবে যারা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন, তাদের জন্য অনুদান নেই! টাকা যার বিদ্যা তার— এই ভাবে সোসাইটি একে পণ্যে পরিণত করেছে। আর তাতে সীলমোহর দিয়েছে গরীব মেহনতি মানুষের বামফ্রন্ট সরকার।

*সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ*

# বিজেপির সাজানো সংসার ততটাই অগোছালো কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিনিধি ।।** নির্বাচনী বিশেষজ্ঞদের মতে এবারের ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনে ২০০৫-এর থেকেও ভালো ফল করতে পারে এনডিএ শিবির। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, অরুণাচলে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিরোধীদের অগোছালো সংসারের যে ফায়দা তুলেছে, ঝাড়খন্ডে এনডিএ শিবিরে সেই দুর্বলতার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নেই। উল্টে ঝাড়খন্ড নির্বাচনের শুরু থেকেই ব্যাকফুটে রয়েছে কংগ্রেস। কোন হেভিওয়েট নেতাকে সামনে রেখে দল লড়বে, তাও নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। তাছাড়া মহারাষ্ট্র, অরুণাচলে নির্বাচনী লড়াইটাই ছিল কংগ্রেস ভার্সেস বিরোধী শিবিরের। সেদিক থেকে ঝাড়খন্ডে লড়াইয়ের চিত্রটাও আলাদা। এখানে লড়াইয়ের প্রধান শক্তিই হচ্ছে বিজেপি বা এনডিএ। ঝাড়খন্ড বিধানসভার ৮১ আসনে লড়ার মতো শক্তিও কংগ্রেসের বা অন্য বিরোধী দলের নেই। গত ৫ বছরে দু-বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে ঝাড়খন্ডে। যার নেপথ্য নায়ক ছিল কংগ্রেস ও তার সহযোগী দল। ফলে ঝাড়খন্ডবাসীও চাইছে একটি স্থায়ী সরকারই ক্ষমতায় বসুক। প্রাক্তন রাজ্যপাল সৈয়দ সিবতে রাজিকে দলের হয়ে ব্যবহার করাটাও রাজ্য-রাজনীতিতে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে কংগ্রেসকে। সম্প্রতি ঝাড়খন্ডের শিল্পপতিদের একাংশ অর্জুন মুন্ডাকে মসনদে দেখার দাবী জানিয়েছে। তাঁদের মতে ২০০৫-এর শুরুতে অর্জুন মুন্ডা মাত্র কয়েকমাসে যে উন্নয়ণ ঘটিয়েছে, তা কংগ্রেসের সহযোগী শিবু সোরেন বা নির্দল মুখ্যমন্ত্রী মধু কোড়ার রাজত্বে এক তৃতীয়াংশ মেলেনি। ২০০৯-এর লোকসভা ভোটের জনাদেশও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গেছে। ১২টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৮টি। কংগ্রেসের আসন মাত্র ১টি।

অন্যদিকে লালুর আরজেডি-র অবস্থাও বেগতিক। কংগ্রেসের ঘর ছাড়ার পর সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে লড়াইয়ে নামার চেষ্টা চালাচ্ছে লালুপ্রসাদ। ২৮ অক্টোবর সিপিএমের একাংশের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। সিপিএম (এল)-র পক্ষ থেকে জোটের বিষয়ে গ্রীন সিগন্যালও দেওয়া হয়েছে। আর জে ডি বা সিপিএম নেতৃত্ব কারও পক্ষেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা নেই। ইউপিএ শিবিরে লালুকে সামিল না করার ক্ষোভ রয়েছে তার মধ্যে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হবার পর লালুর বিরুদ্ধে কমিশন বসানোর কথাও বলেছেন। ফলে লালুর পক্ষে ইউপিএ জোটে যুক্ত হওয়ার আশা কম।

রামবিলাস পাসোয়ানের দল ঝাড়খন্ড নির্বাচনে কোনও ফ্যাক্টরই নয়। মধু কোড়া আয়কর দপ্তরের জালে জড়িয়ে গেছেন। এদিকে বিজেপি শিবির সিবতে রাজিকে অপসারণের পর থেকেই রীতিমতো উজ্জীবিত। শত্রুঘ্ন সিন্‌হা ইতিমধ্যেই ঝাড়খন্ডে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। বিজেপির নেতা-কর্মীদের মতে, ঝাড়খন্ডে ২০০৫-এ বিজেপি একক বৃহত্তম দল হিসাবে এগিয়ে ছিল, এবারও তাই হবে। জেডিইউ কোনও কারণে সরে দাঁড়ালেও বিজেপির ভালো ফলে কোনও প্রভাব পড়বে না। ২০০৫-এ বিজেপি-র আসন ছিল ৩০। কংগ্রেসের ৯টি।

*জনজোয়ারের মাঝে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির অর্জুন মুণ্ডা।*

২০০৫-এ বিধানসভার ফলাফল

| | |
|---|---|
| মোট আসন | ৮১ |
| বিজেপি | ৩০ |
| জেডিইউ | ৬ |
| ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা | ১৭ |
| ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস | ৯ |
| আর জে ডি | ৭ |
| আই এন ডি টি | ৩ |
| ইউ জে ডি পি | ২ |
| এ আই এফ বি | ২ |
| এ জে এস ইউ | ২ |
| ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্ট | ১ |
| ঝাড়খন্ড পার্টি | ১ |
| সিপিআই (এম এল) | ১ |

*বিদ্যার্থী পরিষদের বিজয় মিছিল।*

# হায়দরাবাদে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এবিভিপি-র জয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি ।।** হায়দরাবাদের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বড়সড় সাফল্য পেল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। গত ৯ অক্টোবর ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সবকটি আসনেই পরিষদের প্রার্থীরা বড় ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন। বিরোধী শিবিরে একটি আসনও হাতছাড়া হয়নি তাদের। হায়দরাবাদ ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে পাখির চোখ ছিল বিরোধীদেরও। নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী বিষয়গুলিকেই নির্বাচনী ইস্যু করে পরিষদ। নির্বাচনের আগে থেকেই এগুলিতে ভালোরকম সাড়া পায় পরিষদের নেতা-কর্মীরা। ৯ অক্টোবর হাতে-নাতে তার ফলও মেলে। ২৪৫ ভোটের ব্যবধানে জিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন পরিষদের প্রার্থী চৈতন্য প্রসাদ। সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন শশাঙ্ক উজার ভার্ব। তিনি ১৩৮ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। কালচার সেক্রেটারী বা সাংস্কৃতিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন প্রিয়া। তিনি ৩৩৩ ভোটের ব্যবধানে বিরোধী প্রার্থীকে হারিয়ে দেন। ক্রীড়া সম্পাদকের পদ দখল করেছেন জগজিৎ সিং।

সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদও পরিষদের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে নিজেদের দখলে রেখেছে। পরিষদের এই জয়কে জাতীয়তাবাদী শক্তির জয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছে। প্রত্যাশার থেকেও বড় ধরনের এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশী হয়েছেন পরিষদের নবাগত বিদ্যার্থীরা।

# রাজস্থানে গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি স্কীম নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি ।।** কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানে পাঁচদিনেই ৫৪০টি অভিযোগের ঘটনা ঘটল। বিগত লোকসভা ভোটের আগে অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টী প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। ২০০৯-এ বিভিন্ন রাজ্যে এর হিসেব-নিকেশ করা শুরু হতেই নানা অসংগতি ও অনিয়ম ধরা পড়েছে। এই সকল অনিয়মের মধ্যে রয়েছে — ৬ নং ফর্ম পূরণ না করা। মাস্টার রোলে ভুল-ভাল নাম এন্ট্রি করা, জালনামে জব-কার্ড জারি করা প্রভৃতি।

সবচেয়ে বেশি অভিযোগ এসেছে রাজস্থানের ভীলওয়াড়া জেলার সরপঞ্চ, গ্রামসেবকদের নামে। এমনকী ইঞ্জিনিয়ারদের নামেও অভিযোগ উঠেছে। এখন প্রশাসনিক স্তর থেকে এইসব অভিযোগের তদন্তসাপেক্ষে সমাধান করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তদন্তের ফলাফল জানা যাবে।

এদিকে গত ২ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি স্কীমের নতুন নামকরণ হয়েছে — মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি প্রকল্প। সার্ভেয়ারদের কাছে ৫ থেকে ৯ অক্টোবর-এর মধ্যে ১২৪টি অভিযোগ জমা পড়ে। এছাড়া বেশিরভাগ বেনিয়মের অভিযোগ এসেছে, বিনা টেন্ডারে কাজ করানো এবং চেকের পরিবর্তে নগদে বিল মেটানো নিয়ে। পাকা-বিল-ভাউচারের পরিবর্তে কাঁচা বা সাদা কাগজে বিল করা হয়েছে। ফলে আর্থিক অনিয়মের বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই অর্থের আনুমানিক পরিমাণ এক কোটি টাকার বলে জানা গেছে।

জেলা প্রশাসনের হাল খারাপ এই তদন্তকে সামাল দিতে গিয়ে। ফলে দৈনন্দিন অনেক কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে।

জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যকর্তা মোহনলাল শর্মা এই তদন্তের সত্যতা স্বীকার করেছেন এবং জানিয়েছেন দোষীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশ্ন উঠছে, সারা দেশে কয়েকশো জেলায় ওই গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি যোজনার অধীনে কাজ চলছে। এর ফলে গরীবি রেখার নীচে বসবাসকারীদের সুবিধা হবে। মাত্র একটি প্রদেশের একটি জেলাতেই যদি শত শত অভিযোগ জমা পড়ে তাহলে সহজেই সারা দেশের পরিস্থিতি অনুমান করা যেতে পারে।

# রাশিয়ার সহযোগিতায় মোদীর পেট্রো রাজধানীর স্বপ্নপূরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ।।** মেট্রো রাজধানী থেকে পেট্রো রাজধানী। নরেন্দ্র মোদীর পালকে যুক্ত হলো আরও একটি নতুন পালক। রাশিয়ায় তিন দিনের সফর শেষে গুজরাতের জন্য পূর্ণ করলেন পেট্রোপণ্যের ভাঁড়ার। কিছু উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক এবং কর্পোরেট জগতের লোক-জনদের নিয়ে মস্কো গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। রাশিয়ান কোম্পানীগুলি তাঁকে আশ্বস্ত করেছে পেট্রোলিয়াম এবং শক্তির উৎসের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিনিয়োগ করবে তারা এবং সেইসঙ্গে যাবতীয় কারিগরি সহায়তাও দেবে কোম্পানীগুলি।

গুজরাত সরকারের শিল্প প্রয়াস বর্তমানে মোদীর দৌলতে প্রায় প্রবাদ-এ পরিণত হয়েছে। শিল্পায়নের নিরীখে গুজরাত মোদীর স্বপ্নের দেশের 'মেট্রো রাজধানীতে' পরিণত হয়েছিল আগেই। মোদী মস্কো রওনা হবার আগেই সাংবাদিকদের বলে যান, পেট্রোলিয়াম ও শক্তির উৎসের ক্ষেত্রে গুজরাতের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং আগামীদিনে গুজরাত দেশের পেট্রো-রাজধানীতে পরিণত হতেই পারে।

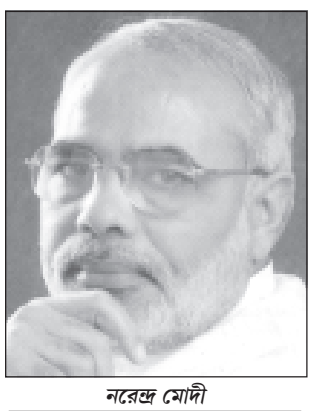

*নরেন্দ্র মোদী*

নরেন্দ্র মোদীর এই 'পেট্রো রাজধানী'র থিম বাস্তবায়িত করতে দু'হাত ভরে এগিয়ে এসেছে রাশিয়ান কোম্পানীগুলো। যেটুকু জানা যাচ্ছে তা হলো, রাশিয়ার কোম্পানী গ্যাজপ্রম দায়িত্ব নিতে চলেছে গুজরাত স্টেট পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের। সেখানে তারা তেল সরবরাহ করবে। এবং গুজরাত-ভাতিন্ডা পাইপলাইনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে চলেছে তারা। নরেন্দ্র মোদী একইসঙ্গে ডেকেছেন রাশিয়ার বৃহৎ টেলিকম সংস্থা সিস্টেমাকে। মোদীর ডাকে সাড়া দিয়ে ওই টেলিকম সংস্থা থেকে জানানো হয়েছে যে, তাদের কয়েক সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে আসবে। এবং গুজরাতের পরিবেশ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বিনিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। ইতিপূর্বে রাজ্যের প্রধান সচিব (শক্তি) এস জগদীশান এবং গুজরাত স্টেট পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডি জগদীশ পান্ডিয়ান—ইটেরা এবং স্ট্রয়ট্রানজ্যাগ নামে দুটি রাশিয়ান বড় 'পেট্রো' সংস্থার সঙ্গে মিলিত হন। এর মধ্যে স্ট্রয়ট্রানজাগ কোম্পানীর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক আলেকজান্ডার রিয়াজানভ জানিয়েছেন তেল এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে বিনিয়োগে তাঁরা আগ্রহী। শিল্পে লিজেন্ড গুজরাত এবং তার মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও একবার প্রমাণ করলেন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। এটাও বোঝালেন, অন্য রাজ্যকে শিল্পে গুজরাতের কাছে পৌঁছতে গেলে দরকার রাজ্য সরকারের সততা ও সদিচ্ছা।

# মাওবাদের উৎস সন্ধানে

**দেবব্রত চৌধুরী**

প্রচুর রক্তপাত, অশেষ কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে আমরা ভারতবাসীরা পৌঁছেছিলাম শরতের সকালে আজ থেকে ৬২ বছর আগে। স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল না হতেই আর এক স্বপ্ন রঙীন করে তুলেছিল দেশবাসীর চেতনাকে। নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ হয়ে ওঠার আগ্রহে আমাদের যাত্রা হয়েছিল শুরু। সামনে ছিল দুটি সমস্যা।

*মাওবাদী সন্দেহে ধৃত রাজা সরখেল*

*মাওবাদী সন্দেহে ধৃত প্রসূন চট্টোপাধ্যায়*

*মাওবাদী মুখপাত্র গৌর চক্রবর্তী।*

সবাইকে পেট পুরে খেতে দিতে হবে। শিল্পে বিনিয়োগের হার বাড়িয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে। স্বাধীনতার সময় আমাদের খাদ্যশস্য খুব একটা কম ছিল না, ঘাটতি ছিল মাত্র ৫ শতাংশ। ভাবা হয়েছিল সেচ ও সারের ব্যবস্থা করে এবং জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে এই ঘাটতি মিটিয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু স্বাধীনতার ১৭ বছর পর দেখা গেল খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৩০ শতাংশ বাড়লেও সবাইকে পেট পুরে খেতে দেবার সমস্যাটা আরও তীব্র হয়েছে। ভবিষ্যতে কৃষিক্ষেত্রে মানুষের চাপ বাড়বে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের জন্য। এই সহজ সত্যটা আমরা যেমন বুঝলাম না, তেমনি গ্রামের অল্পে সন্তুষ্ট কৃষকরাও পারিবারিক চাহিদার সীমিত গন্ডিতে আবদ্ধ থেকে এগিয়ে এলেন না উৎপাদন বৃদ্ধির আকাশ ছোঁয়া উৎসাহ নিয়ে। আবার শিল্পে বিনিয়োগের হার দ্রুত বাড়াতে গিয়ে নজর দেওয়া হল ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে। কিন্তু নজর দেওয়া হল না এসব জিনিস ভোগ করার সামর্থ্য ক'জনের আছে? সিনথেটিক রেয়ন, ফ্রীজ, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, টিভি ও মোবাইল-এর সীমাহীন উৎপাদনের চাহিদা সামাল দিতে গিয়ে দেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে স্বচ্ছল করে তোলার চেষ্টা হলো পে-স্কেল, বোনাস ইত্যাদি বাড়িয়ে, তাও মুষ্টিমেয় সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে।

এ সত্ত্বেও স্বর্গের সিংহদ্বারে পৌঁছতে পারলাম না আমরা — দেশের ডান-বাম সব রাজনৈতিক নেতারা তাদের হাঁক কমালেন না। তারা উন্নতশীল দেশগুলির কিছু কিছু নীতি নিয়ে দেশের উন্নয়ণের পরিকল্পনা করার চেষ্টায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার বা আন্দোলনে নামার হুঙ্কার দিলেন। মার্কিন গণতন্ত্র ও রুশীয় পরিকল্পনার ককটেল আমাদের বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। সমাজতন্ত্র না গণতন্ত্র — এই বিষয়ে মন স্থির করতেই আমরা পারলাম না। এই দোদুল্যমান অবস্থাতে ঢেউয়ের ধাক্কায় যতদূর এগোনো যায় প্রাকৃতিক নিয়মে তাই করতে লাগলাম আমরা। বামপন্থীরা চাইলেন সাত তাড়াতাড়ি রাশিয়া, চীনের আদর্শে এগিয়ে যেতে। তারা কখনও বিচার করলেন না এ দেশের মাটিতে কোনও নতুন গাছ বেড়ে উঠতে পারবে কি না — কারণ দেশের মাটির চরিত্র সম্বন্ধে তারা ছিলেন অজ্ঞ। বিপরীত দিকে কংগ্রেস নেতারা রাশিয়া, আমেরিকা কাকে আদর্শ করবেন এটি ঠিক করতেই কাটিয়ে দিলেন বহু বৎসর। কারণ ভারতীয় মানুষের নাড়ি তারা বুঝতেই চাননি বা পারেননি। কিন্তু আদর্শের ব্যাপারে ডান ও বাম রাজনৈতিক নেতাদের এই অস্থিরতা থাকলেও, একটি বিষয়ে তারা সহমত ছিলেন— ক্ষমতা চাই। শাসক দল চাইল যেনতেন প্রকারে গদী ধরে রাখতে। আর বামদলগুলি চেষ্টা করে যেতে লাগল ভাল-মন্দ যে কোনও পথেই হোক ক্ষমতা দখলে। মূল লক্ষ্যটি এভাবে স্থির হয়ে যাওয়ায় আদর্শের ব্যাপারে অশুভ কার্যকলাপের সাথে আপোষ করে নিল ডান-বাম উভয়েই। ফলে কর্মসূচীর সাথে আদর্শের ফারাক ঘটে গেল।

এইভাবে জাতীয় উন্নতির প্রশ্নটি রইলো উপেক্ষিত। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে জনসাধারণকে দলীয় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা বলতে লাগল। যার ফলে জাতীয় স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থর মধ্যে লাগল সংঘাত। শাসকদলগুলি চাইল জনসাধারণকে পাইয়ে দেবার রাজনীতির মাধ্যমে নিজেদের সমর্থক করে তুলতে। বিরোধীরা চাইল জনগণকে সংঘাত অস্থিরতা-আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করে তাদের দলীয় স্বার্থের দিকে সমর্থন ছিনিয়ে আনতে। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এই দেউলিয়াপনা ক্রমশ সংক্রামিত হলো জন সাধারণের মধ্যে। দিন যতই এগোতে লাগল, আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌রা ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল রাজনীতি থেকে। ক্ষমতা দখলই যখন মূল উদ্দেশ্য, তখন পেশাদারী রাজনীতিবিদ্‌রা আদর্শের বালাই ঝেড়ে ফেলে মঞ্চে অবির্ভূত হলেন ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী নিয়ে। শহর-গঞ্জে আর অজগাঁয়ে নকশাল ও মাওবাদী তকমা দিয়ে। দল চালাতে টাকার দরকার। পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট নেতার আবির্ভাব হল। তারা টাকার সমস্যাটা মেটাতে লাগলেন জনগণকে চোখ রাঙিয়ে তোলা তুলে বা লুট করে, বা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে। নেতারা এসব দেখেও চুপ করে রইলেন। কারণ নির্বাচনে এই সব সমাজ বিরোধীরাই তো একমাত্র ভরসা

আদর্শবান জ্ঞানীগুণীরা যতই সরে যেতে লাগলেন, রাজনীতির মঞ্চ কে ততই বেশি করে কব্জা করতে লাগল পেশাদারী রাজনীতিবিদের দল। যারা সামাজিক, রাজনৈতিক, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মকুশলতায় দুর্বল। একটি দেশকে গড়ে তুলতে গেলে যতখানি ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হয় এইসব পেশাদারী নেতা-নেত্রীদের তা নেই। আদর্শবান জ্ঞানী-গুণীরা যেমন সরে যাচ্ছেন তেমনি আদর্শবান স্বাধীন বুদ্ধি জীবীরাও সরে আসছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে। এই সুযোগে একদল ভেজাল বুদ্ধি জীবীরা এগিয়ে আসছেন। তারা কমিটেড কোনও না কোনও দলের প্রতি। এদের ক্রিয়াকলাপ যতখানি জনস্বার্থের অনুসারী। তার চেয়ে বেশি স্বীয় স্বার্থের অনুসারী, জাগতিক সাফল্যের তীব্র আকাঙ্খায় তারা হয় পেশাদার রাজনীতিবিদ্‌দের পোষমানা হাতিয়ার, আর স্বাধীন বুদ্ধি জীবীদের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমাজ। ইউরোপ বা আমেরিকায় স্বাধীন বুদ্ধি জীবীরা যে ভূমিকা পালন করছেন এদেশের বুদ্ধি জীবীরা তা করেন না। অন্যদিকে আর এক যন্ত্রণা — পত্রিকার, টিভির সাংবাদিকেরা সামাজিক শক্তির কল্যাণীয় রূপটি তুলে ধরার চেয়ে রাজনৈতিক নোঙরামির ছবি আঁকতে বেশি উৎসাহী। শিক্ষক-অধ্যাপকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনীতির হাত থেকে বাঁচানোর বদলে 'ওইগুলিকে রাজনীতির আখড়া করে তুলতেই ব্যস্ত। সাহিত্যিকরা মৌলিক চিন্তার চেয়ে 'বাজারে মাল' ছড়াতেই বেশি আগ্রহী।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এইসব ধান্দাবাজ রাজনীতিবিদরা প্রথমেই বেছে নেন দুর্দশাগ্রস্ত অভাবে জর্জ্জরিত অশিক্ষিত সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত অঞ্চলের মানুষগুলিকে। যারা বেঁচে থাকা ও মরে যাওয়া এই দুইয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ খুঁজে পায় না। তবু যে কয়দিন এই ধারায় থাকবে সে কয় দিন কোনও মতে জামা-কাপড় খাওয়া-পরা অন্তত এসব পেয়েই মরবে; কখনও পুলিশ বা যৌথ বাহিনীর গুলি নয়তো কোনও রাজনৈতিক দলের ঠ্যাঙানীতে হয়তো নিজ দলের নেতার হাতে যেমনভাবে মরতে হয়েছিল ট্রটস্কিকে।

*সাংবাদিকের মুখোমুখি মাওবাদী নেতা কোটেশ্বর রাও।*

# সরকারি তহবিলই কী মাও

**নিজস্ব প্রতিনিধি।। ধৃত মাওবাদীদের এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা মাওবাদীদের জেরা করে জানা গেছে, সরকারের উন্নয়ণ তহবিলই মাওবাদীদের আয়ের প্রধান উৎস। যেকোনও সন্ত্রাসবাদী দল বা গোষ্ঠীকে পরাভূত করতে হলে প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো তাদের যাবতীয় সাপ্লাইলাইন কেটে দেওয়া। প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবেই উঠেছে যে, সারা ভারত জুড়ে মাওবাদীদের বিশাল নেটওয়ার্ক, গেরিলা বহিনী, ব্যাপক পরিমাণে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। এসকল ব্যবস্থা চলছে কীভাবে?**

**জনজাতি অধ্যুষিত মাওবাদ বা নকশালবাদ প্রভাবিত রাজ্যগুলোতে লাল সন্ত্রাস দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এবিষয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে কিছু খবর বেরিয়ে এসেছে। তাতেই দেখা গিয়েছে, সরকারি উন্নয়ণ তহবিলই অতিবাম সন্ত্রাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারি উন্নয়ণ তহবিলের একটা মোটা ভাগ, যা জনজাতিবহুল এলাকার কাজে দেওয়া হয় তা মাওবাদীদের হাতে চালান হয়ে যাচ্ছে। ওই বিপুল অর্থ মাওবাদীরা প্রধানত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে ব্যয় করে থাকে। যার ফলে সন্ত্রাসের পরিধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এসম্পর্কে অনেক খবরা-খবর জানিয়েছেন ছত্তিশগড়ের এক মাওবাদী প্ল্যাটুন কমাণ্ডার— মারকন মুর্দরাজ। তিনি মাওবাদীদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে মতের পরিবর্তন করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, ব্লকস্তরে ও পঞ্চায়েত অফিসার এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলা তুলে নিয়মিতভাবে অর্থসংগ্রহ করে মাওবাদীরা।**

*মাওবাদীদের সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলা সদ*

**মুর্দরাজ-এর নিজের জবানবন্দী— "২০০৫ সালে ছত্তিশগড়-অন্ধ্রপ্রদেশ সীমান্তে লাক্ষুণ্ডুডা গ্রামে বস্তাভর্তি ৩৩ লক্ষ টাকার কারেন্সিসহ পুলিশ আমাকে পাকড়াও করেছিল।" বর্তমানে মুর্দরাজ ছত্তিশগড়ের স্পেশাল পুলিশ অফিসার। মাওবাদীদের সংসর্গ পরিত্যাগ করার খেসারত দিতে হয়েছে মুর্দরাজকে। তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে মাওবাদীরা। সপরিবারে ত্রাণশিবিরে গিয়ে উঠেছেন মুর্দরাজ। ওই শিবির চালাচ্ছে মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত জনজাতি বাহিনী 'সালভা জুডুম'। মুর্দরাজ আরও জানিয়েছেন, "মাওবাদীরা পঞ্চায়েতের হাতে উন্নয়ণের জন্য বরাদ্দ অর্থের পঞ্চাশভাগই বন্দুকের নলের মুখে হস্তগত করে। উদাহরণ হিসেবে, গ্রামবাসীদের দিয়ে পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের গ্রামে রাস্তা, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি নির্মাণের জন্য বাধ্য করায়। অফিসারদের সঙ্গে মাওবাদীদের দারুণ মাখামাখি সম্পর্ক রয়েছে। পঞ্চায়েতের অফিসাররা লুটের বখরাও রীতিমতো পেয়ে থাকেন।"**

# মাওবাদী সন্ত্রাসে রক্তাক্ত ভারত

বাসুদেব পাল

রক্তে লাল জঙ্গলমহল। রক্তে লাল হচ্ছে ভারতবর্ষের মাটি। চলছে লাল সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাসের নাম মাওবাদী সন্ত্রাস। একদা পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি থেকে ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি শুরু করেছিল চীনপন্থী — থুড়ি মাওপন্থী (মাও সে তুং)

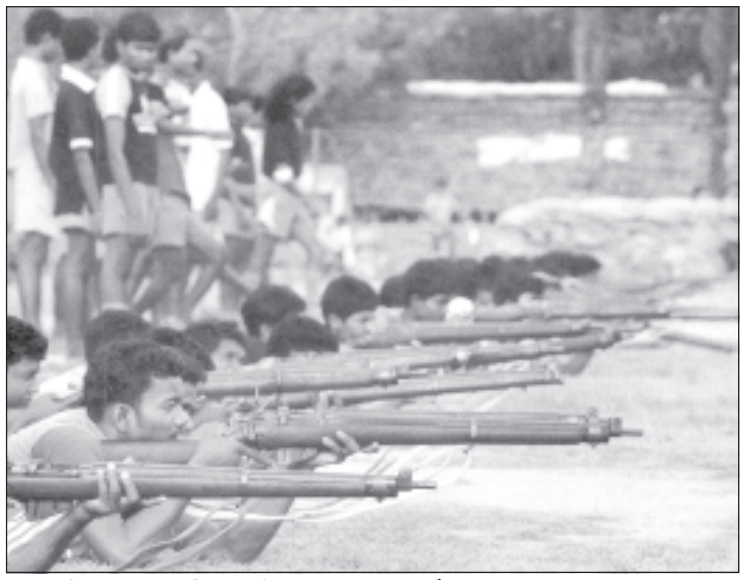

*ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গঠিত সালওয়া জুডুমের সদস্যরা।*

নকশালবাদীরা। নকশাল আন্দোলনের নামে কয়েকবছরের মধ্যে কয়েকশ যুবকের মৃত্যু হয় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের পুলিশের হাতে। পরে নকশালরা দেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা হারায়। তিরিশটির বেশি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা সংগঠিত হওয়ার সুযোগ ও সময় পেয়ে যায় — ২০০৪-এর সংসদীয় নির্বাচনে সোনিয়া কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় বসার পর। এদিকে চীনের সাহায্যে নেপালের মাওবাদীরা রাজতন্ত্র তথা রাজাকে উৎখাত করার জন্য রাজকীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষমেশ জনগণের ভোটে জিতে মোর্চা সরকারও গঠন করে।

ঘোলাজলে মাছ ধরতে অভ্যস্ত ভারতবর্ষের সি পি আই এবং সি পি এম-এর শীর্ষ নেতারা নেপালে রাজা ক্ষমতায় থাকাকালীন মাওবাদীদের সমর্থন জানাতে কাঠমান্ডু সফরে গিয়েছিলেন। সেই প্রতিনিধিদলে এ বি বর্ধন, সীতারাম ইয়েচুরি, সস্ত্রীক প্রকাশ কারাত, ডি রাজা প্রমুখ ছিলেন। শুধু এই ঘটনাই নয়, ২০০৪-এ অন্ধ্রপ্রদেশে বিধানসভার নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। অন্ধ্রে টিকে থাকা মাওবাদীরা (পিপুলস্ ওয়ার গ্রুপ) কোরামিন পেয়ে যায়। ওয়াকিবহাল মহলের খবর হল, সদ্যপ্রয়াত রাজশেখর রেড্ডিকে ক্ষমতায় বসাতে মাওবাদীরা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিল। মাওবাদীরা আগের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুকে কয়েকবার হত্যার প্রয়াস করেছিল। এদিকে কেন্দ্র সরকার চলছিল ভারতের বামমোর্চার সমর্থনে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মাওবাদীরা সবকটি নকশাল গোষ্ঠীকে একত্রিত করে পার্টি কংগ্রেস করে ছত্তিশগড়ের এক গভীর জঙ্গলে। MCC, PWG এবং অন্য সকলে এক হয়ে গঠিত হয় সি পি আই (মাওয়িস্ট)।

এরপরই আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে প্রশিক্ষিত মাওবাদী ক্যাডাররা সংগঠন তৈরি করতে রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারই সর্বশেষ ঘটনা — গত ২০ অক্টোবর দিন দুপুরে পশ্চিম-মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল থানা ও ব্যাঙ্কে আক্রমণ। দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর থানার ভিতরে নিহত আর স্বয়ং ওসি তাঁর কোয়ার্টার থেকে পণবন্দী এবং ব্যাঙ্ক থেকে নয় লক্ষাধিক টাকা লুট। পরে মাওবাদী দলের পলিটব্যুরোর সদস্য কিষেনজীর বদান্যতায় যুদ্ধ বন্দী আখ্যায়িত ওসি'র সকুশল মুক্তি। এখন পশ্চিমবঙ্গে গোয়েন্দা পুলিশ-এর সদর দপ্তর 'ভবানী ভবন' সরগরম। ওসি অতীন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোয়েন্দারা কিষেনজীর অবস্থান এবং মাওবাদীদের গতিবিধি বিষয়ে অভিহিত হতে চাইছেন। তবে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সাঁকরাইল-ই একমাত্র ঘটনা নয়। সারা ভারত জুড়েই। সম্প্রতি তিন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে মাওবাদী হামলায় সরাসরি সংঘর্ষে মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলায় ১৭ জন পুলিশ মারা যায়। কয়েকদিন আগে ছত্তিশগড়েও কোবরা বাহিনীর বারোজন জওয়ানকে মাওবাদী গেরিলারা হত্যা করে। মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড় এবং অন্ধ্রপ্রদেশের লগোয়া বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে মাওবাদী গেরিলা বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ঝাড়খন্ডের খুন্তি জেলার হেমব্রম বাজার থেকে সকাল বেলায় গোয়েন্দা অফিসার ইন্দুবরকে অপহরণ করে। পরে ইন্দুবরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ইন্দুবর মাওবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে খবরা-খবর যোগাড় করতেন। ২০০৪ থেকে এ পর্যন্ত মাওবাদীরা ৫,০০০-এর মতো পুলিশকর্মী, সন্ত্রাসী এবং সাধারণ নাগরিক মাওবাদী লাল সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাওবাদী সন্ত্রাসকেই দেশের সর্বাধিক আভ্যন্তরীণ বিপদ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই বিপদকে বা চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করাই কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছে সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ।

মাওবাদী গেরিলাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা রয়েছে। তা হলো — তারা বনাঞ্চলে গভীর জঙ্গলে জীবন-যাপন, ঘোরাফেরায় অভ্যস্ত। সরকারের অপপ্রয়াসে যে জনজাতিরা ওইসব অঞ্চলে বসবাস করছে তাদের রয়েছে সীমাহীন দারিদ্র্য এবং অনুন্নয়ণ। তাদের কাছ থেকে প্রভূত জনসমর্থন ও সহানুভূতি পাচ্ছে মাওবাদীরা। মাওবাদী গেরিলাদের কাছে

*ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে গ্রেপ্তার হওয়া মাওবাদীরা।*

রয়েছে একে ৪৭ সিরিজের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, প্রচুর পরিমাণে সফিস্টিকেটেড মাইন ও গ্রেনেড। এমনকী রকেট লঞ্চার। গত নভেম্বর মাসে তারা ভারতীয় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে গুলি চালিয়ে একজন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারকে মেরে ফেলেছিল। হয়তো, তারপরই বিমানবাহিনী প্রতি-আক্রমণের জন্য সরকারের কাছে অনুমতি চায়।

১৯৬৭ সালে আমূল 'ভূমিসংস্কার'-এর নামে প্রান্তিক কৃষকদের স্বার্থরক্ষার্থে 'নকশাল' আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যে

*গোপন স্থানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে মাওবাদীরা।*

সময় এই প্রতিবেদন লেখা হচ্ছে, ততদিন মাওবাদীরা ভারতের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে কুড়িটিতেই অবস্থান মজবুত করে জনাধার তৈরি করছে। এবছর মাওবাদ সম্পর্কিত সন্ত্রাস ৬০০ জনের বেশি মানুষের জীবনহানি ঘটিয়েছে। প্রতিদিনই এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সম্প্রতি সরকার এই রক্তঝরা লালসন্ত্রাস দমনে ৭০ হাজার প্যারামিলিটারি ফোর্সকে কাজে লাগিয়েছে বিভিন্ন কৌশলগত এলাকায়। এই এলাকাটাই 'রেড করিডর' বলে বহুল প্রচলিত এবং প্রচারিত। সরকারের বিশেষত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ নিঃসন্দেহে অল আউট অ্যাটাকে যাওয়ার লক্ষণ। এর আগে কোনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এরকম মনোভাব দেখা যায়নি। তিনি এই অভ্যন্তরীণ বিপদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন বলা যেতে পারে। তবে এজন্য অতি সক্রিয়তা, নিখুঁত পরিকল্পনা, তাবৎ নিরাপত্তাবাহিনীর মধ্যে সুশৃঙ্খল যোগাযোগ ও সমবেত প্রয়াস-এর যোজনা করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। অক্টোবর মাসের গোড়ায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের সাব কমিটির সভায় অতিবাম বিপ্লবীদের গেরিলা বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের মতো ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সংবাদ সূত্রে প্রকাশিত।

চিদাম্বরমের পরিকল্পনায় মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় তাদেরকে হঠানোর জন্য অনুন্নত ও জনজাতি ক্ষেত্রে উন্নয়ণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণও রয়েছে। এলাকার উন্নয়ণের কাজ, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আসার পরই বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে জানা গেছে। একাজের দায়িত্ব দেশের নিরাপত্তাবাহিনীর বলে চিদাম্বরম্ মনে করেন। রাজ্যের পক্ষে এজন্য আগাম পর্যবেক্ষণ ও নির্দিষ্ট খবরা-খবর সংগ্রহ করা দরকার। এখনও পর্যন্ত কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি অপারেশনে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারি ফোর্সের জীবনহানি ঘটেছে। অপরপক্ষে মাওবাদীরা গ্রামবাসীদের মানব প্রাচীর হিসেবে ব্যবহার করছে। নাগরিক অধিকার রক্ষাকারী এন জি ও-রা নানা সমালোচনা ও হৈ চৈ করছে। চিদাম্বরম্ সাহেব প্রভাবিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরকে মাওবাদীদের আলোচনা ও কথাবার্তার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বলেছেন। এক্ষেত্রে মাওবাদীরা সাড়া না দিলে, তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

*(এরপর ১৩ পাতায়)*

## কী মাওবাদীদের তহবিল ?

**ওই প্রাক্তন মাওবাদী কমাণ্ডারের আরও বক্তব্য, যে সকল ঠিকাদার কন্ট্রাক্টররা গ্রামে কাজের বরাত পায়, তাদের মাওবাদীদের প্রচুর টাকা দিতে হয়। ফলে কাজ হয় অতি নিম্নমানের। এক্ষেত্রে বাংলা-বিহার-ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড-ছত্তিশগড় একাকার। দান্তেওয়াড়া জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট অমরেশ মিশ্রও উপরোক্ত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সরকারি গণবন্টন ব্যবস্থা থেকে মাওবাদীরা ব্যাপক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য এবং রাস্তা তৈরির টাকা লুঠ করছে বলে বিস্তর অভিযোগ। অনেক ক্ষেত্রে মাওবাদীরা সরাসরি স্কুলের গোডাউনে হানা দিয়ে ছাত্রদের নির্দিষ্ট মিড-ডে মিলের চাল-ডালও লুঠ করতে পিছপা হয় না। বস্তুত, ২০০-৩০০ মাওবাদী ক্যাডারের একত্রে খাওয়া-দাওয়ার জন্য বাসনপত্রও গ্রামের স্কুলবাড়ি থেকেই পাওয়া যায়। সম্প্রতি লালগড়ের জঙ্গলে করমসোল গ্রামের স্কুলবাড়িকে মাওবাদীরা ব্যবহার করেছিল বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে মাওবাদীদের জন্য রান্নাবান্না গ্রামবাসীদেরই করে দিতে হয়। মুর্দরাজের বক্তব্য, খাবারে বিষ মেশানো আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে গ্রামবাসীদের কাউকে সর্বপ্রথম সেই খাবার খেতে বাধ্য করা হয়।**

**ছত্তিশগড় পুলিশ যেসব নথিপত্র মাওবাদীদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে, সেখানে দেখা গেছে, মাওবাদীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০০৯ থেকে প্রতিটি কন্সট্রাকশন কাজে নিদেনপক্ষে শতকরা তিনভাগ 'লেভি' আদায় করবে। মতিলাল সরেন, মাকরান মুর্দরাজ প্রভৃতি হার্ডকোর মাওবাদীদের গ্রেপ্তার করার পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। সেই অনুসারে মাওবাদীরা এক এক বস্তা কেন্দু পাতার জন্য মহাজনদের বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ৬০ টাকা হারে আদায় করে থাকে। সকল তথ্য একত্রিত করলে দেখা যাচ্ছে, মাওবাদীদের সিংহভাগ খরচ জনগণের বা সরকারি তহবিল থেকেই আসে। এছাড়া গাঁজার মতো নিষিদ্ধ মাদক পাচারও মাওবাদীদের আয়ের অন্যতম উৎস। বস্তারের মোবাইল চেকপোস্ট এবছর তিনটি ট্রাক থেকে ১২০০ কিলোগ্রাম গাঁজা আটক করেছে। এছাড়াও পাঁচটি ট্রাক ভর্তি গাঁজা আটক করেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, প্রধানত ওড়িশা থেকেই গাঁজা নিয়ে এসে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী এবং মুম্বাইয়ে চালান করা হয়।**

**ছত্তিশগড় পুলিশের ডিজি মনে করেন, মাওবাদীরা পাঁচ-ছয়টি রাজ্য থেকেই প্রতিবছর ১৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পারে। এই অর্থ তারা অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ কেনা, প্রচার চালানো এবং প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করে। তিনি আরও বলেছেন, উল্টোদিকে গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ণ বরাদ্দ বন্ধ করে দিলে ব্যবস্থা সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও জনজাতি সমাজকে মাওবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে জনজাতিদের উনয়ণের স্বার্থেই— বলে ডি জি মন্তব্য করেছেন। আর অনুন্নয়ণই মাওবাদীদের জনজাতিদের মধ্যে শিকড় গেড়ে জাঁকিয়ে বসতে সাহায্য করছে।**

# বি বি সি-র ভারত বিরোধিতা

কিছুদিন আগে বি বি সি-তে ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনীর হাতে কাশ্মীরীদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রচারিত হলো। গত রবিবার, ১৩-০৯-০৯ তারিখে তা আবার পুনঃপ্রচারিত হলো। নিঃসন্দেহে এই প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর সামনে ভারতকে হেয় করা।

এখন আমার প্রশ্ন ঐ "নির্যাতিত" কাশ্মীরীরা অন্যদের উপর যখন বর্বরোচিত, বীভৎস অত্যাচার চালায় তার কথা তো বি বি সি প্রচার করে না। তারা নির্মম, পাশবিক অত্যাচার তথা অবাধ হত্যালীলা, ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি করে কাশ্মীর উপত্যকায় ১০ লক্ষ হিন্দু পণ্ডিতদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে তাঁদের বিষয় সম্পত্তি দখল করে, নিরীহ পর্যটকদের হত্যা করে, গেরিলা কায়দায় শতশত ভারতীয় জওয়ানদের হত্যা করে তখন বি বি সি নীরব থাকে কেন? আর মানবাধিকার? মানুষ হলে তো তার মানবাধিকার। যারা শিশু, নারী বৃদ্ধ -বৃদ্ধাসহ নিরীহ, নিরপরাধ মানুষদের বর্বরোচিত ভাবে হত্যা করছে তারা কি মানুষ যে মানবাধিকার দাবী করতে পারে? আর এই বর্বর হত্যাকারীদের মানবাধিকার থাকলে তাদের Victim-দের মানবাধিকার নেই?

বি বি সি হয়তো যুক্তি দেখাতে পারে কাশ্মীরীরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করছে আর এইসব নৃশংস খুন তাঁরই অঙ্গ। কিন্তু কাশ্মীর তো স্বাধীন ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য। আর একটি যুক্তরাষ্ট্রের কোনও অঙ্গরাজ্য চাইলেই কি তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে? অসম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম ইত্যাদি রাজ্যগুলিও তো স্বাধীনতা চাইছে। তা দিতে হবে? তাহলে ভারত বলে কিছু থাকবে না — বল্কান রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আজ যদি ট্রান্সড্রা ইংল্যাণ্ড থেকে, কালিফোর্নিয়া, টেকসাস্ ইত্যাদি রাজ্য হ.ব্র.ট্ট. থেকে, সিন্ধু, বালুচিস্তান পাকিস্তান থেকে কিংবা হিন্দু প্রধান খুলনা ও বৌদ্ধ প্রধান পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হতে চায় তবে তা মঞ্জুর করা হবে? বি বি সি খুলে বলুক।

বি বি সি যুক্তি দেখাতে পারে কাশ্মীর মুসলমান প্রধান রাজ্য। অতএব তা পাকিস্তানের প্রাপ্য। কিন্তু মুসলিম প্রধান অঞ্চল তো ভারতে আরও আছে যেমন এই পশ্চিমবাংলায়, অসমে, কেরলে, বিহারেও। তাছাড়া ভারতে এখন মুসলিম সংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। তারা ভারতে থাকতে পারলে কাশ্মীরের মুসলমানরা পারবে না কেন?

আসলে ভারত বিভাগ হয়েছিল মুসলিম লীগ তথা জিন্নার দ্বিজাতি-তত্ত্বের দাবীর ভিত্তিতে। তাদের দাবী ছিল হিন্দু মুসলমান সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। তাদের পক্ষে একসাথে, একরাষ্ট্রে বসবাস করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই দেশ বিভাগ করে মুসলিমদের বসবাসের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান চাই। ক্ষমতার লোভে গান্ধী-নেহরু জিন্নার কাছে নতজানু হয়ে সে দাবী মেনে নিলেন। কিন্তু আমরা দেখলাম কোটি কোটি মুসলমান পাকিস্তানে না থেকে "হিন্দু" ভারতেই থেকে গেলেন। সাধের পাকিস্তানে তাঁদের ঠাঁই হল না। আজ আমরা আরও দেখছি ভারতে যে কোটি কোটি মুসলমান রয়ে গেলেন হিন্দুদের সাথে পাশাপাশি বাস তথা চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করতে তাঁদের কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না। তাই কি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন যে, দেশের সম্পদে তাঁদের অগ্রাধিকার? তাঁরাই এখন ভারতে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। আরও দেখছি যে হিন্দু এলাকায় মুসলমানরা বিশাল বিশাল বাড়ি তৈরি করছেন, সেখানে একটি প্লট বা ফ্ল্যাটের জন্য বা হিন্দুদের পাশাপাশি যে কোনও চাকরি করার জন্য তাঁরা যা কিছু করা সম্ভব তা করছেন, যাকে বলে Heaving no stone unturned। এখানে কলকাতায় এই প্রান্তে বেহালায় অমি যাদের থেকে ফল, মাংস, সব্জি কিনি, ছাতা সারাই তারা সবাই পাসপোর্ট-ভিসাবিহীন বাংলাদেশী মুসলিম। আজ এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে Open Border দিয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম ভারতে চলে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে এবং আসছে। এমনকি কাঁটাতারের বেড়া দিয়েও তা রোখা যাচ্ছে না। প্রতি বছর হাজার হাজার বাংলাদেশী মুসলমান ভারতে এসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে দিল্লী, মুম্বাই ইত্যাদি শহরে তো রীতিমতো বাংলাদেশী কলোনি গড়ে তুলেছে।

তাহলে আমার প্রশ্ন মুসলিম লীগ তথা জিন্নার সেই দ্বিজাতিতত্ত্ব এখন কোথায় গেল? মাঝখান থেকে দেশ বিভাগ করে কোটি কোটি নিরীহ, নিরপরাধ, নর-নারীর (এদের সিংহভাগ বাঙালী হিন্দু) চরম সর্বনাশ করা হলো ইতিহাসে যার তুলনা মেলা ভার।

কিছুদিন আগে বি বি সি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের দুঃখ, দুর্দশা নিয়ে কয়েকটি প্রতিবেদন প্রচার করেছিল। এই প্রসঙ্গে গত ০৪।১০।২০০৭ তারিখে আমি কয়েকটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে বি বি সি-কে লিখেছিলাম যে কীভাবে বাংলাদেশে হিন্দুরা অসহায়ভাবে জীবন-যাপন করছেন, তাঁদের ঘরবাড়ি, বিষয় সম্পত্তি বলপূর্বক দখল করে পথের ভিখারী করে দিচ্ছেন প্রতিবেশী মুসলিমরা। বি বি সি-কে বলেছিলাম যে বাংলাদেশের অসহায় হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব অভিযোগ নিয়ে যেন তাঁরা অনুরূপ প্রতিবেদন প্রচার করেন। কিন্তু বি বি সি তা করেনি।

তাই বলছিলাম যে বি বি সি যেন এইরূপ একপেশে সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার না করে অন্তত কিছুটা নিরপেক্ষ মনোভাব নেয়।

*সুহাস বসু, বেহালা, কলকাতা-৬০*

## চিঠিপত্র

# অখন্ড ভারত ভাবনা

দুই কিস্তিতে বিস্তারিত, (স্বস্তিকা, ১৭ ও ১৮ আগস্ট), 'অখন্ড ভারত ভাবনা' শীর্ষক নিবন্ধে 'খন্ডিত ভারত'-এর পুনর্বার অখন্ড রূপ পাবার অবশ্যম্ভাবিতা বিচার-বিশ্লেষণের শুরুতে দু'টি ভুল কথা বলা হয়েছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলিকে চার্চিলের পূর্বসূরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, দেশভাগের সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চার্চিল। বস্তুত, এটলি চার্চিলের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কার্যকাল ছিল ১৯৪৫-১৯৫১ সাল। অর্থাৎ দেশভাগের সময় এটলি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, চার্চিল নয়।

কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনার 'প্রেক্ষাপটে' নিবন্ধকার 'অখন্ড ভারত' ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, ওই সকল ঘটনার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতির চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুদ্ধে পর্যুদস্ত জার্মানদের দেশ-দ্বিখন্ডন মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাই, সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে পড়ার সাথে সাথে দুই জার্মানি আবার এক হয়ে গিয়েছে। আর, ভিয়েতনাম যখন স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্সকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল, তখন জেনেভা কনভেনশনের সিদ্ধান্তে ১৯৫৪ সালে দেশটাকে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত ফরাসী ও মার্কিন সামরিক শক্তি হো-চো-মিনের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। পরিণামে দ্বিখন্ডিত ভিয়েতনাম এক হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, ওই দুই দেশের জনগণ দেশভাগ চায়নি। অপরদিকে ভারতের মুসলমান দ্বি-জাতি তত্ত্বের জিগির তুলে ভারত ভাগের দাবীতে ভীষণভাবে সক্রিয় ছিল। পরবর্তী কালে উপমহাদেশের মুসলিম-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে, তেমন কোনও নজির নেই। উল্লেখ্য, বোম্বাই-এর (মুম্বাই) একটি পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা হিসাবে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে আসা 'Muslim Politics in Secular India'-এর লেখক হামিদ দলওয়াই বোম্বে ফিরে যাবার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় মুসলমান সমাজের বিচিত্র মানসিকতার উল্লেখ করে বলেছিলেন — 'এদেশের মুসলমানরা চায় না যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হোক। তাঁরা মনে করেন, অখন্ড পাকিস্তান ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য এদেশের উপর যতটা চাপ সৃষ্টি করতে পারবে — পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হলে তা আর সম্ভবপর হবে না। তাই, পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতীয় মুসলমানদের একটা বড় অংশই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিবর রহমানের বিরোধী'— ('দাঙ্গার ইতিহাস'—শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ : ২৮১)। গান্ধীবাদী শৈলেশবাবু স্বাভাবিক ভাবেই সেই সময় দলওয়াই-এর কথা বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু, তারপর তিনি বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে বুঝেছিলেন, দলওয়াই-এর কথা কত খাঁটি (ঐ)। আমরা জানি, 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের 'চিন্তা-ভাবনা'র কথা অসমের প্রাক্তন রাজ্যপাল লে জে (রিটায়ার্ড) এস কে সিন্‌হা অনুপ্রবেশ নিয়ে তাঁর রিপোর্টে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণকে জানিয়েছিলেন।

নিবন্ধকার পাকিস্তান, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমহলে বেড়ে উঠা 'Unification of India' চিন্তার "চোরাস্রোত"-এর কথা জানিয়ে বলেছেন — আগামী দিনে অখন্ড ভারতের দাবী উঠবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে;ভারতের হিন্দুদেরও (মুসলমানদের নয়?) অখন্ড ভারতের বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। এখানে প্রশ্ন, নিবন্ধকার স্বয়ং কি ওই বার্তায় ভরসা রাখেন? গোড়াতে তিনি বলেছেন, 'সম্পত্তি বাপের না, সম্পত্তি দাপের'। সোজা কথায়, যার লাঠি, তার মাটি। খাঁটি কথা। গৌতম বুদ্ধের শরণাগত সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যও 'লাঠির জোরেই' অক্ষত থেকেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে। উপসংহার, তিনি 'De Islamisation'-এর কথা বলেছেন। বলেছেন, প্রায় আড়াই হাজার মসজিদ চার্চে রূপান্তরিত করে আজ স্পেন খৃস্টান দেশ। তাঁর বক্তব্য, স্পেনে যা সম্ভব হয়েছিল, ভারতেও তা সম্ভব হবে।

নিবন্ধকার অধিকন্তু বলেছেন — ২০৩৮ সাল নাগাদ 'ইসলাম' লোপ পাবে। হজরৎ মহম্মদ না কি বলে গিয়েছেন যে, ইসলামের আয়ু ১৪০০ বছর। কোরান হাদিসে ওরকম কোনও কথা আছে বলে জানা নেই। নিবন্ধকার, মনে হয়, ষোড়শ শতকের ফরাসী জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ ডাঃ নস্ট্রাদামুসের রহস্যময় ভবিষ্যদ্বানীর সাথে বিষয়টি গুলিয়ে ফেলেছেন। যাই হোক, নিবন্ধকারের ভাবনা বলছে — ওই সময় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের, যারা কয়েক পুরুষ আগেও হিন্দু ছিলেন, হিন্দুরা উদার হৃদয়ে আহ্বান জানালে পরাবর্তনের মাধ্যমে তাঁরা স্বধর্মে ফিরে আসবেন। বলা বাহুল্য, নিবন্দোক্ত বিভিন্ন স্রোতধারায় ভেসে আগামী দিনের প্রত্যাশিত 'অখন্ড ভারত' কোন পথে, কি রূপে আসবে তার দিশা পাওয়া গেল না।

'অখন্ড ভারত'-এর ভাবনা অবশ্যই স্বাগত। কিন্তু, আমাদের আশু প্রয়োজন, 'ভাগে পাওয়া' ভূখন্ডের অখন্ডতা ধরে রাখার ভাবনা। স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই ওই ভূখন্ডের বেশ কিছু অঞ্চল পাকিস্তান ও চীন জবরদখল করে রেখেছে। নরম মাটি পেয়ে বাংলাদেশও সেই পথে হাঁটার চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে কলকাতার একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদসূত্রে জানা গিয়েছে, অসমের ভিতরে ঢুকে বি ডি আর বাংলাদেশী পতাকা পুঁতে রেখেছে। কোথায় লাঠৌষধি প্রয়োগ করা হবে, তা নয়, বি এস এফকে বলা হয়েছে বি ডি আর-এর সাথে আলোচনায় বসতে। অলমিতি বিস্তরেণ।

*বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০*

# আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খোলা হবে বলে ঘোষণা করেন। মুসলিমদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হোক। কিন্তু আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা নামে আমাদের আপত্তি আছে। বিশিষ্ট ভারতীয় মুসলমানের নামে হতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানের আঁতুর ঘর আলিগড়ের নামে কখনই বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে না। এখন কংগ্রেস এবং টি এম সি, আগে সি পি এম ন্যাক্কারজনক মুসলিম তোষণের রাজনীতিতে নেমেছে। এরা আবার নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে জাহির করে? এদের কোনও লজ্জা-শরম নেই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন যে, রেলে মাদ্রাসা স্কুলের ছেলে-মেয়েদের কোনও ভাড়া লাগবে না। শুধু মাদ্রাসা স্কুলের ছেলে-মেয়েরা রেলে সুবিধা পাবে কেন? হিন্দু, জৈন, শিখ ইত্যাদি ছেলে-মেয়েরা সুযোগ পাবে না কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। হিন্দুদের ঘরে গরীব ছেলে-মেয়ে নেই? শুধু মুসলিমদের ঘরে আছে! এরা দেশটাকে পাকিস্তানে পরিণত করতে চাইছে। হিন্দুত্ববাদীরা তা কখনই হতে দেবে না।

*অধ্যাপক আশিষ রায়, বি. গার্ডেন, হাওড়া।*

# কথায় ও কাজে

পরিবেশ দপ্তর থেকে শব্দবাজী ফাটানো অপরাধ বলে গণ্য। শব্দবাজী শব্দ দূষণ ঘটায়। তার সঙ্গে বায়ু দূষণও হয়। তাই শব্দবাজী তৈরি বিক্রয় ও ব্যবহার সরকারি নানাভাবে অপরাধ বলে নানা স্থানে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ বাজী বাজায়াপ্ত করে ও দোষীদের শাস্তির বন্দোবস্ত করে। কিন্তু সবেবরাত-এ যে শব্দ বাজী কাটে তার সমন্ধে নীরব বলে মনে হয়। গত ৬। ৮। ০৯ তারিখের রাত্রে সবেবরাত উপলক্ষে শব্দ বাজি ফাটানো হয়। গড়বেতা ১নং ব্লকের গড়বেতা থানার কর্তারা নিশ্চয় তা শুনেছেন থানায় বসে। তিন কিলোমিটার দূরে যদি বাজির শব্দ আসে সেটা নিশ্চয় শব্দবাজী বলা যেতে পারে, বোমা বাজীও বলা চলে। পুলিশের বক্তব্য যে কোনও অভিযোগ পাইনি, অতএব শব্দবাজী ফাটছে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত তা দুপক্ষেও জানি না বলা দরকার। সবেবরাত-এ যারা শব্দবাজী ফাটাল তারা এখন শাসক ও বিরোধী দলের চোখের মণি। সুতরাং অভিযোগ করবে কে? আর ধর্মীয় আচরণের বাধা দিচ্ছে এটা যাতে প্রমাণ না হয় তাই পুলিশ নীরব। শক্তের ভক্ত নরমের যম। এখনকার কর্মচারী যত দোষ, নন্দ ঘোষ।

*রবি ঘোষ, মেদিনীপুর।*

পরম্পরা

পুরুষোত্তম স্বামী

## ভক্তাধীন ভগবান

# ভক্ত সুন্দরনাথ

*যে তু সর্বানি কর্মাণি ময়ি সংনস্য মৎপরাঃ।*
*অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।*
*তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।*
*ভবানি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্।।*

**(গীতা ১২।৬-৭)**

ঈশ্বরে অনন্যচিত্ত যাঁরা, সত্যই কি তাঁদের মৃত্যু, অপরাধে আকীর্ন এই সংসার হতে ভগবান উদ্ধার করেন? প্রশ্নটা ঘুরপাক খায় বিশ বছরের যুবক সুন্দরনাথের মধ্যে। বার্ধক্যকে যাঁরা ঈশ্বর আরাধনার একমাত্র সময় বলে মেনে নিয়েছেন, সুন্দর সে দলে যাননি। বরং যৌবনের শুরুতেই মেতে ওঠেন তিনি ভগবৎ দর্শনের আকাঙ্খায়। সদগুরু ভগবানের অলক্ষ্য কৃপায় তাঁর জীবনে যুক্ত হয়েছে দিব্যশব্দধারা বা ঐশী প্রবাহ। যে প্রবাহ পৌঁছে দিতে পারে তাঁকে পরমাত্মার আনন্দ নিকেতনে।

কস্তুরী মৃগ যেমন আপন নাভির সুগন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে ইতিউতি দৌঁড়ায়, সুন্দরের অবস্থা হয় তদ্রুপ। ঘর ছেড়ে পাড়ি দেন বাইরে। সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে হিমালয়ের ভূবৈকুণ্ঠ বদ্রিনাথের পথে-বদরিনারায়ণ ভগবান দর্শন মানসে।

দাক্ষিণাত্যের মানুষ সহজাত শ্রীবিষ্ণু ভক্তিপ্রবণ। সুন্দরের মধ্যে উক্ত ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাল্যকাল থেকে তিনি পিতা-মাতার কাছ থেকে জেনেছেন — আরাধনাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম। তাই বদরিনারায়ণ ভগবানের যোগমূর্তি দর্শন করে প্রবেশ করতে চান যোগরাজ্যে।

পদব্রজে চলেছেন পাহাড়ী সর্পিল পথ বেয়ে বদরি বিশাল দর্শনে। কার্তিক মাস। তুষারপাত শুরু হয়েছে হিমালয়ে। পথশ্রমে ক্লান্ত। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়েছেন। বদ্রিনাথ যেদিন পৌঁছলেন, মন্দির তখন শীতাভাসে বন্ধ হতে চলেছে।

মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেখলেন প্রধান পুরোহিত রাওয়ালজী মন্দির বন্ধের তোড়জোড় করছেন। সুন্দরনাথ রাওয়ালজীকে হাতজোড় করে বারবার মিনতি করলেন তালা না বন্ধ করতে। একবার হৃদয়নাথ বদরিবিশালকে দর্শনের সৌভাগ্য দিতে। কর্ণপাত করলেন না রাওয়ালজী। মন্দিরের রীতি তিনি সামান্য একজন যাত্রীর জন্য লঙঘন করতে পারেন না। মন্দির বন্ধ করে দিলেন তিনি। বললেন সুন্দরকে আবার বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়ায় আসতে। সেদিন খোলা হবে মন্দির। বললেন — এখুনি তুমি এস্থান ছেড়ে চলে যাও, নয়তো বরফে তোমায় চাপা পড়তে হবে-মৃত্যু নিশ্চিত।

নিরুপায় সুন্দরনাথ। ফিরে যাবার সামর্থ্য নেই। বন্ধ দরজার সামনে আকুল ক্রন্দন করতে লাগলেন — হে দীননাথ, হে দয়াল, একটি বার তোমার চোখের দেখা দেখতে দিলে না। ইচ্ছা অপূর্ণ রাখলে। যা হবার হোক। আমি এস্থান ছেড়ে যাব না। তাতে প্রাণ যায় যাক্।

সন্ধ্যা ঘনায়মান। শুরু হয়েছে পেঁজা তুলোর মতো তুষারপাত। সোঁ সোঁ শব্দে বইছে হিমেল বাতাস। নিচে অলকানন্দার গমন-গর্জন। জনহীন বদ্রিনাথ। একা মন্দির চাতালে হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন সুন্দরনাথ।

নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন। হঠাৎ কানে পৌঁছাল চেনা এক কণ্ঠ — এ কি এখানে এখনও তুমি! ভারি জিদ তো তোমার। দুর্যোগের মধ্যেও চলে যাওনি। কি আর করবো। চল এবার ভিতরে। দেবদর্শন করে নাও।

এ তো রাওয়ালজীর কণ্ঠস্বর। ঠান্ডায় অবশ শরীরটা কোনওভাবে টেনে তুললেন। সুন্দর দেখলেন রাওয়ালজী মন্দিরের তালা খুলছেন।

দ্বার খোলা হলে যত্ন করে রাওয়াল তাঁকে নিয়ে গেলেন মন্দিরের ভিতরে। বদরিবিশালের যোগমূর্তি দর্শন করে

অভিভূত সুন্দর। এতরূপ, এত জ্যোতির্ময় শ্রীঅঙ্গ বদরিনাথ ভগবানের, ভাবতে পারেননি তিনি। বিভোর রূপদর্শনে।

রাওয়ালজীর কথায় আবেশ ভাঙল তাঁর — একি! বস্ত্র যে ভিজে গেছে। নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বস্ত্র সাথে আনোনি। ঠিক আছে। ব্যবস্থা করছি আমি। বলে বদ্রিনাথজীর একটি হলুদ বস্ত্র তাঁকে দিলেন। বললেন — এবার বদল করে নাও ভিজে বস্ত্র।

ভগবানে অর্পিত বস্ত্র। কিছুটা সঙ্কোচ জাগলেও রাওয়ালজীর কথা মতো পড়ে নিলেন তিনি।

বাঃ বেশ দেখাচ্ছে তো তোমাকে। এবার তোমাকে প্রসাদ দিচ্ছি। খেয়ে নাও। এই বলে বদ্রিনাথজীর প্রসাদ মুঠো ভরে দিতে লাগলেন। তারপর প্রভুর গেলাসে রাখা জল পান করালেন তাঁকে প্রধান পুরোহিত। বাস্তবে এমন সুমিষ্ট পানীয় জল কখনও পান করেছেন বলে মনে পড়ে না সুন্দরের।

দর্শন, প্রসাদ গ্রহণ শেষ হলে সুন্দরনাথ রাওয়ালজীকে বললেন — মহারাজ এবার আমরা ফিরে যাই। সে কি? এত রাতে এই পাহাড়ী পথে যাবে কোথায়? বাইরে ভীষণ তুষারপাত হচ্ছে। তুমি আজকের রাত বরং মন্দিরে থাকো। কাল সকালে আমি এসে দরজা খুললে তখন যেও — স্নেহঝরা কণ্ঠে বললেন রাওয়ালজী।

সুন্দরকে তিনি শুতে দিলেন বদরিবিশালের শয্যায়। মনে কুণ্ঠা থাকলেও রাওয়ালজীর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারলেন না তিনি।

এই দিকে ছয় মাস অতিক্রান্ত। বদ্রিনাথজীর মন্দিরে দরজা খোলার দিন উপস্থিত। বাইরে ভক্তদের জয়ধ্বনি — জয় বদরিবিশাল কি জয়। রাওয়ালজী মন্দিরের বিশাল তালা খুলে মন্দিরে ঢুকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দুই চোখ। শয্যায় নিদ্রিত এক জ্যোতির্মন্ডিত শরীর। আচ্ছাদিত দেহ তাঁর প্রভুর গৌরিক বস্ত্রে। কে দিল ওঁকে এই বস্ত্র। খুব চেনা চেনা লাগছে।

নিদ্রা টুটে গেছে সুন্দরনাথের। রাওয়ালজীকে দেখে সষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। রাওয়ালজীর শরীর ঘিরে একরাশ প্রশ্ন তখন। কেমন করে ছেলেটি ঢুকল এই দুর্ভেদ্য মন্দিরে। কে চাবি খুলে দিল।

প্রশ্ন করতেই উত্তর যা পেলেন তাতে বিস্ময় চতুর্গুণ হয়ে উঠল। সুন্দরনাথ বেশ সহজভাবেই বললেন — মহারাজ আপনিই তো গতকাল রাতে মন্দির খুলে আমায় বস্ত্র দিলেন, প্রসাদ দিলেন, সবশেষে এই শয্যায় শুইয়ে দিলেন।

রাওয়ালজীর শুনে মূর্চ্ছা যাবার যোগাড়। কোনও মতে নিজেকে সামলে বললেন বিহ্বল কণ্ঠে — গতকাল! কি বলছো তুমি! আমি তো ছ'মাস বাদে মন্দিরের দ্বার খুলছি। আর তুমি কি না!

ভাবতে মাথা ঘুরতে শুরু করেছে রাওয়ালজীর। মন্দিরের চাবি ছিল টিহারী রাজদরবারে খাজাঞ্চি খানায়। সেদিন সকালে চাবি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আর এই যুবক তো ছ'মাস আগে মন্দির বন্ধর সময় আসে। মন্দিরে তখন তিনি তালা ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। অথচ যুবক ভিতরে গেলেন। প্রসাদ পেলেন। শয্যায় নিদ্রা গেলেন। তাহলে তাঁর রূপ ধরে কে সাহায্য করলেন যুবককে! তবে কি স্বয়ং ভক্ত বৎসল প্রভু ভক্তের সেবার ভার নিজে তুলে নিলেন।

বলা বাহুল্য এরপর ভক্ত সুন্দরনাথের আত্মপ্রকাশ ঘটে শিবপ্রতিম মহাযোগী সুন্দরনাথের হিমবন্তের হিমভূমিতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে।

# হিন্দু শাস্ত্রে রত্ন বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ বিদ্যা

রবীন সেনগুপ্ত

জ্যোতিষ বিদ্যার সাধারণত দুটি দিক রয়েছে। তার মধ্যে একটি অংশে শাস্ত্র নির্ধারিত রত্ন, ধাতু, মূল, কবচ ইত্যাদি ব্যবহার করা, রত্নদি শোধন করার জন্য শাস্ত্রসম্মত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা, হস্তরেখা বিজ্ঞান, দেহের বিভিন্ন চিহ্ন নিয়ে অধ্যয়ন— এইসব করার প্রয়োজন হয়। এই অংশগুলিতে নির্দিষ্ট ধরনের বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

যেমন গরুড় পুরাণের পূর্ব খণ্ডের ৬৯ অধ্যায়ের ৩৯তম শ্লোক থেকে বলা হয়েছে যে, যদি কোনও মুক্তাকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ হয় তবে সেটিকে লবনমিশ্রিত জলে একরাত্রি রাখবে। তারপর সেটিকে ধানের সঙ্গে মর্দন করে শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা বেস্টন করে রাখবে। এরপরও যদি মুক্তটি বিবর্ণ না হয়, তাহলে সেটিকে খাঁটি বলে জানবে।

৬৮ অধ্যায়ে (একই পুরাণের) বলা হয়েছে যে, প্রকৃতিতে যে সকল রত্ন মুখ্য বলে গণ্য করা উচিত, সেগুলি হল— মণি, মুক্তা, পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ, কর্কেতন, স্ফটিক, প্রবাল ইত্যাদি। এর মধ্যে হিমালয়, মাতঙ্গ পর্বত, সৌরাষ্ট্র, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, কোশল, বেন্বাতট ও সৌবীর — এই কয়টি অঞ্চল হীরকের জন্য বিখ্যাত। হিমালয়জাত হীরক ঈষৎ তামাটে বর্ণের, বেন্বাতটজাত হীরক ঈষৎ চন্দ্র কিরণের ন্যায়, সৌবীর দেশজ হীরক নীলপদ্ম ও মেঘের ন্যায় আভাসম্পন্ন, কোশল দেশীয় হীরক ঈষৎ পীতবর্ণ, পুণ্ড্রদেশীয় হীরক ঈষৎ শ্যামবর্ণ— ইত্যাদি। যে হীরা জলে নিক্ষেপ করলে ডুবে যায় না, তা শ্রেষ্ঠ বলে জানবে। হীরক ও পদ্মরাগ এতই কঠিন পদার্থ যে এদের দ্বারা পৃথিবীর সকল প্রকার ধাতু ও রত্নকেই কাটা যায়। কিন্তু অপর কোনও পদার্থ দ্বারা হীরক কাটা যায় না, হীরা ছেদনের জন্য হীরকই ব্যবহার করতে হয়।

উক্ত গরুড় পুরাণেরই ৭১তম অধ্যায়ের শেষের অংশ থেকে আমরা জানতে পারছি যে, কোনও মরকতমণি যদি নকল হয় তাহলে সেটির ওপর ভল্লাতক পত্রের বাতাস দিলে সেটির বর্ণ পরিবর্তন ঘটে। আর যেসব অকৃত্রিম মরকতমণির দীপ্তি বাঁকাভাবে পতিত হয় তাদের তেজ শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়। দুগ্ধ সহযোগে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করলে পদ্মরাগ মণি যতটা উত্তাপ সহ্য করতে পারে ইন্দ্রনীলমণি তার চেয়ে অধিক উত্তাপ সহ্য করতে পারে। তবুও ঘনঘন পরীক্ষার জন্য মণি অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে নেই। দাহদোষে দূষিত মণি থেকে মানবের অমঙ্গল ঘটতে পারে।

৭৫ অধ্যায়ে বলা আছে যে, সুবর্ণপাত্র দ্বারা বেষ্টিত করে অগ্নিতে প্রতপ্ত করলে কর্কেতন মণির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়।

কোনও গ্রহের দোষ নিবারণের জন্য কি রত্ন ব্যবহার করতে হয়, সেই রত্নটির পরিবর্তে কি ধাতু বা কোন প্রকার মূল বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যায়, সেই বিষয়েও হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রর নানা স্থানে তথ্য প্রদান করা আছে। যেমন রবি প্রতিকূল হলে মাণিক বা চুনী, বিল্বমূল, তামা বা সোনা ব্যবহার করতে হয়। চন্দ্র প্রতিকূল হলে প্রতিকারার্থে ৫ থেকে ৮ রতি মুক্তা, ক্ষিরিকামূল বা রূপা ব্যবহার করতে হয়। মঙ্গলের জন্য ১০ থেকে ২০ রতি প্রবাল, অনন্তমূল বা রক্তবর্ণ তামা, সোনা ব্যবহার করা যায়। বুধের জন্য মরকত বা পান্না ৩ থেকে ৬ রতি, বৃহদ্দারক মূল বা রূপা ব্যবহার করা যায়। বৃহস্পতির জন্য পুষ্পরাগ বা পোখরাজ ৪ থেকে ৫ রতি, বামনষষ্ঠীর মূল বা রূপা ব্যবহার করা যায়। শুক্রনীচস্থ থাকলে ৩ থেকে ৫ রতি হীরা, প্লাটিনাম ধাতু বা রামবাসকের মূল সুফলদায়ী। শনির কোপ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নীলা বা নীলকান্তমণি ৫ থেকে ৮ রতি, শ্বেতবেড়েলার মূল বা সীসা ব্যবহার করা যায়। রাহু ও কেতুর জন্য ৫ থেকে ৭ রতি গোমেদ এবং ৬ থেকে ৮ রতি বৈদুর্য্য বা ক্যাটস আই ব্যবহার করা শাস্ত্র সম্মত। রাহুর জন্য ইস্পাত বা শ্বেতচন্দন মূল, কেতুর জন্য লোহা ও অশ্বগন্ধা মূল ব্যবহার করতে হয়।

তাছাড়া রত্ন, কবচ যেমন খুশী ব্যবহার করলেই হয় না। যথাযথ ভাবে অর্থদান করে গ্রহের ধ্যান করে, রত্নে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, রত্ন শোধন করে, কিছু খাদ্য পোশাক, সঙ্গী নির্বাচনের আচার-বিচার মেনে এসব ব্যবহার করতে হয়। রত্নের একটা বিজ্ঞান রয়েছে ঠিকই, তার সঙ্গে যুক্ত করতে হয় পরম্পরায় বিশ্বাস। এই সমন্বয় না থাকলে জ্যোতিষে সুফল পাওয়া দুষ্কর।

# গৃহিনীর কর্তব্য

বোধ কথা

**নিজস্ব প্রতিনিধি** ।। একবার গৌতম বুদ্ধ কোনও কারণে অনাথপিন্ডক নামে এক ধনী ব্যবসায়ীর (শেঠজী) ঘরে ঘুরতে আসেন। অনেকদিন পরে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দু'জনে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। হঠাৎ এমন সময় ঘরের ভিতর প্রচন্ড চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা গেল। এমন অবাঞ্ছিত ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়লেন অনাথপিন্ডক। গৌতম বুদ্ধ ও তা বুঝতে পারলেন শেঠজীর চোখ-মুখ দেখে। শেঠজীর এই বিব্রত অবস্থা দেখে তথাগত নিজেই প্রশ্ন করলেন। জানতে চাইলেন ভিতরের অশান্তির কারণ।

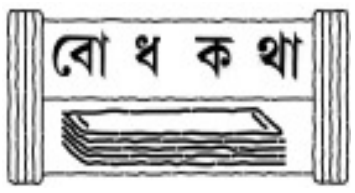

শেঠজী ধীরে ধীরে সব বৃতান্ত খুলে বললেন। বললেন, আমার পুত্রবধূ-র জন্যই এই অশান্তি। ওই আমার ঘরের পরিবেশকে অশান্ত করে তুলেছে। প্রতিদিনই কোনও না কোনও বিষয়ে ঝগড়া করে। একবার রেগে গেলে সহজে শান্ত হয় না। স্বামীর প্রতিও বিন্দুমাত্র ভক্তি নেই। আমি শ্বশুড় হলেও, আমাকে হেয় করে। শেঠজীর মুখে সব কথা শুনলেন তথাগত। শেঠজী অন্য কথা বলার আগেই তাঁর বৌমাকে ডেকে আনতে বললেন তিনি। পুত্রবধূ সুজাতার রাগ তখনও কমেনি। মনে মনে ফুঁসছিলেন। বুদ্ধ দেবকে অবজ্ঞা না করলেও কোনও সম্মান জানালেন না। সুজাতা শুধু পুতুলের মতো বুদ্ধ দেবের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনও রা কাড়লেন না। বুদ্ধ দেব নিজে মুখ খুললেন। বসতে বললেন শেঠজীকে, শেঠজীর পুত্রবধূকেও। তথাগত সুজাতার উদ্দেশ্যে বললেন, সংসারে সাত প্রকার গৃহিনীর মধ্যে তুমি কোন প্রকারের গৃহিনী? সুজাতা বুদ্ধ দেবের এই প্রশ্নে চমকে উঠলেন। তাঁর কথার অর্থও বুঝতে পারলেন না। তাই একটু বিনয়ী হয়েই বললেন, মহারাজ আমি আপনার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না। অনুগ্রহ করে খুলে বলুন। বুদ্ধ দেব বললেন, সমাজে সাত প্রকারের গৃহিনী বা বধূ হয়। প্রথমত, যে বধূ সব সময় ক্রোধী, স্বামীর প্রতি হেয় মনোভাব, স্বামীকে অবজ্ঞা করে, পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এদের স্বভাব ব্যাভিচারিণীদের মতো। তাই এদের ব্যাভিচারিণী গৃহিনী বলে। দ্বিতীয় প্রকার গৃহিনীর বৈশিষ্ট্য হলো তারা স্বামীর সম্পত্তির দিকে কু-নজর দেয়। তাই এদের চোর-এর মতো অর্থাৎ চোরসমা গৃহিনী বলে। আর যে সব বধূ কর্কশ প্রকৃতির, অলস, স্বামীর থেকে নিজেকে বড় ভাবে, এমন গৃহিনী আর্যসমা গৃহিনী। অন্যদিকে যে পত্নী সর্বদা স্বামীর কথা চিন্তা করে, নিজের প্রাণের থেকেও যার কাছে স্বামী প্রিয় সেই গৃহিনী মাতৃসমা গৃহিনী। যে গৃহিনী ভগ্নীর মতো স্বামীকে স্নেহ করে, নীরবে তাকে অনুসরণ করে, সেই গৃহিনীকে ভগ্নীসমা গৃহিনী বলা হয়। ষষ্ঠ প্রকার গৃহিনী হোল সখীসমা। এরা স্বামীর শত অত্যাচার সত্ত্বেও স্বামীকে দেবতা ভাবে, ক্ষুব্ধ হয় না। তাই এরা সখীসমা গৃহিনী। আর সপ্তম গৃহিনীর বৈশিষ্ট্য হোল দাসীসমা গৃহিনী।

এবার বলো, তুমি এই সাত প্রকার-এর মধ্যে কোন প্রকার গৃহিনী? তথাগত-র এই প্রশ্নে চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল সুজাতার। তিনি ভগবান বুদ্ধ র পা জড়িয়ে ধরলেন। চাইলেন ক্ষমা।

## ।। চিত্রকথা ।। গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ ।। ১

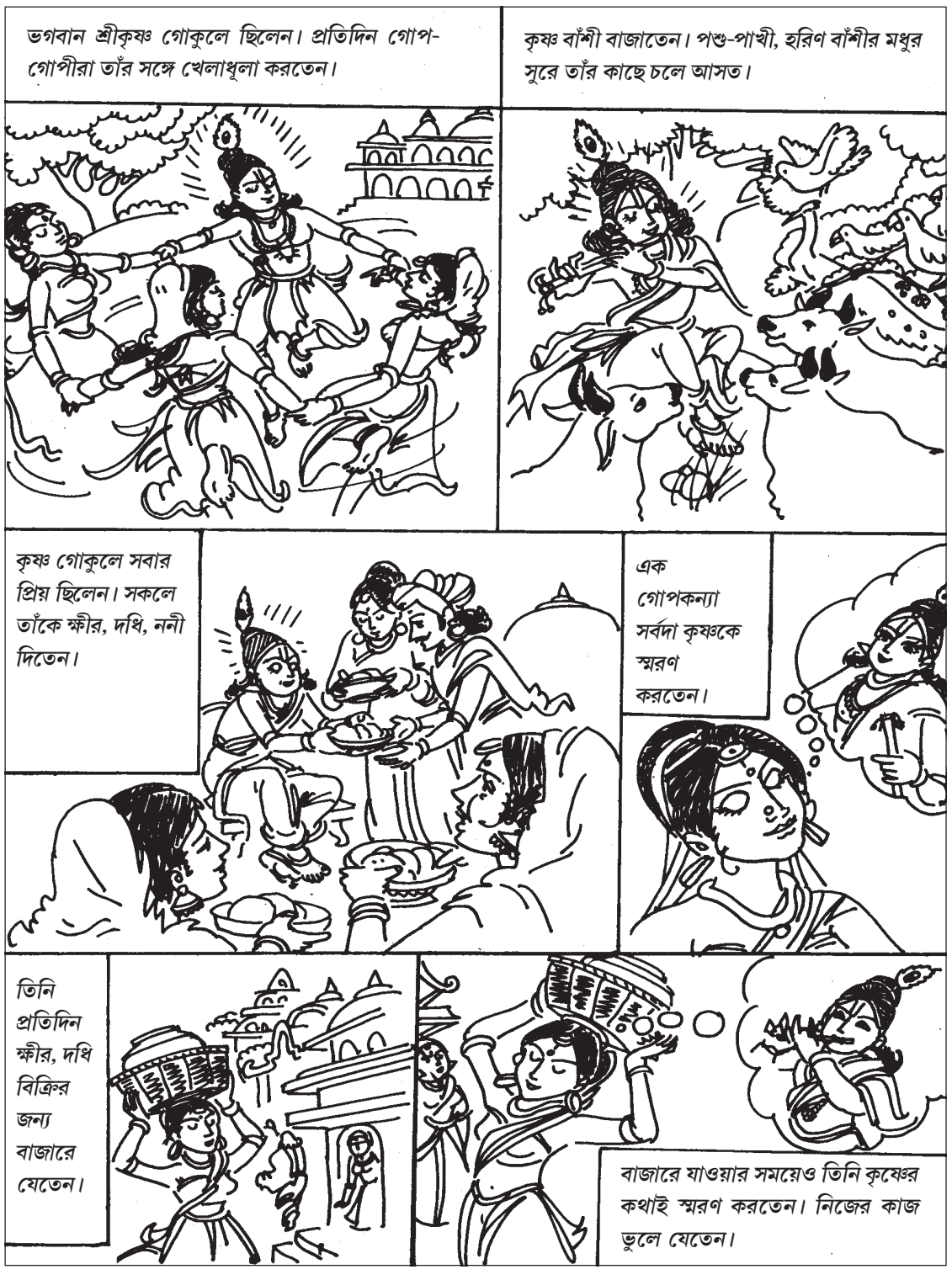




## বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর ।।

পাকিস্তানের বড়োদরা এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ছাত্রী তাতহির নিজের রক্ত ও চুল ব্যবহার করে এশীয় সমাজে বিশেষত ভারত ও পাকিস্তানে মহিলাদের অবস্থার ওপর আটটি মূর্তি তৈরি করেন। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তাতহির বলেন, 'আমি নিজের তৈরি মূর্তিগুলির একটা অংশ হতে চেয়েছিলাম। তাই নিজের রক্ত ও চুল ব্যবহার করেছি।'

✸ ✸ ✸

পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষেপুত গ্রামে ৩০০ বছর ধরে সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পারিবারিক কালীপুজো হয় তাঁদের নিজস্ব আটচালা সংলগ্ন মন্দিরে। পুজোর কাজ শুরু বিজয়া দশমী থেকে। বাড়ির ইশারা পুকুর থেকে মাটি তুলে আটচালাতেই প্রতিমা তৈরি হয়। এখানে ঘড়ি ধরে পুজো অচল। মাটির হাঁড়িতে জল রেখে পুকুরে প্রদীপ ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ওই প্রদীপে থাকে ছোট্ট ছিদ্র। সেই ছিদ্র দিয়ে জল ঢুকে প্রদীপ পূর্ণ হয়ে গেলে তা ডুবে যায়। ডুবতে সময় লাগে ২৪ মিনিট। তখন পুরোহিত হাঁড়িতে চন্দনের টিপ পরান। একেকটি টিপ হলো ২৪ মিনিটের সূচক। রাত্রে বাড়ির পুকুরে ঘট ডুবিয়ে কালী পুজো শুরু হয়।

✸ ✸ ✸

চাইলে হাত বাড়িয়ে হয় তো চাঁদটাও ছুঁতে পারেন। তুরস্কের মানুষ সুলতান কোসেন, উচ্চতায় যিনি ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি। গিনেস বুক অব্ ওয়ার্লড রেকর্ড-এ বর্তমানে বিশ্বের সব থেকে লম্বা ব্যক্তির শিরোপা অর্জন করেছেন। দশ বছর বয়সের পর পিটুইটারি গ্রন্থিতে টিউমারের কারণে চড়চড় করে বেড়ে যান। উচ্চতম হওয়ার হ্যাপাও কম নয় — না চড়া যায় গাড়ি, না পরা যায় ফ্যাশনেবল জামা-কাপড়। প্রতিবেশীরা তাঁর সাহায্য চান। ঘরের বাল্ব পাল্টাতে বা নতুন পর্দা টাঙানোর জন্য। কিন্তু আজও জোটেনি একজন গার্লফ্রেন্ড, বিয়ে তো দূর অস্ত। রেকর্ড গড়ার পর এই খ্যাতনামা পুরুষটির আশা, এবার হয়তো জুটে যাবে একজন 'কোম'।

✸ ✸ ✸

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ঘুড়ির লড়াই ছিল কলকাতার বাবুবিলাস। একশ টাকার নোট জুড়ে জুড়ে তৈরি করা হতো ঘুড়ির লেজ। কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে ঘুড়ির লড়াই ছিল বাবুবিলাসের এক রোমাঞ্চ কর শখ। ঘুড়ির ম্যাচে হেরে বহু বাবু সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বর্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদকে রাজত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য একবার আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। তিনি আসল প্রতাপচাঁদ কিনা তা প্রমাণ করতে হয়েছিল কানের একটি কাটা দাগ দেখিয়ে। একবার ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে সুতোয় কান কেটে গিয়েছিল প্রতাপচাঁদের। এই কাটা দাগই তাঁকে রাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করে।

✸ ✸ ✸

'মলত্যাগ করুন শুধু স্নানের সময়'— এরকমই প্রচার চালাচ্ছে এক ব্রাজিলীয় পরিবেশ রক্ষা সংস্থা— এস ও এস মাটা আটলান্টিকা। জলের খরচ কমাতেই নাকি এই অভিনব প্রচার। সংস্থার মতে, প্রস্রাবের পর প্রতিটি ফ্লাশে ১২ লিটার জল খরচ হয়। তাই সারা দিনে সবকটি ফ্ল্যাশকে ধর্তব্যে ধরলে মোট ৪৩৮০ লিটার জল। আর প্রস্রাবেরও ৯৫ শতাংশই জল। বাকিটা তৈরি ইউরিয়া ও লবন সহযোগে। তাই প্রস্রাবের পর স্নানের পরামর্শ দিচ্ছে এই সংস্থা।

## র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

দর্শনার্থী — ফেস্টুনে সার্বজনীন দুর্গাপুজো লিখেছেন কেন? কথাটা তো সর্বজনীন হবে; সর্বজন থেকে সর্বজনীন, আকার এল কোত্থেকে?

উদ্যোক্তা — জানেন না, হিন্দুধর্মে নিরাকারের পুজো হয় না!

☺ ☺ ☺

রোগী — ডাক্তারবাবু, আজকাল আমি সবই দুটো করে দেখি।

ডাক্তার — ঠিক আছে, আগে চেয়ারে বসুন, পরীক্ষা করে দেখছি।

রোগী — কোন চেয়ারে?

☺ ☺ ☺

— উত্তমকুমারের পুরো নাম কি বলতো।

— মহানায়ক উত্তমকুমার!

— উঁহু, উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। উত্তম নাম পরে হয়েছে।

— আগে কি নামে ছিল রে?

— কেন, টালিগঞ্জ!

☺ ☺ ☺

ভক্ত — প্রভু, বিয়ের আগে কোনও মেয়ের সঙ্গে এক শয্যায় ঘুমনো কি অন্যায়?

ভগবান — না, কিন্তু তোমরা তো সারারাত ঘুমোতে পারবে না, বৎস!

☺ ☺ ☺

প্রশ্ন — কোন্ সুখ ভাল লাগে না?

উত্তর — অসুখ।

—নীলাদ্রি

## মগজচর্চা

১। ১৮৯৬ সালে বাংলা সায়েন্স ফিকশন হিসেবে 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' নামে যে-গল্পটি প্রকাশিত হয় তার লেখক কে?

২। 'আমার জীবনই আমার বাণী' — কে একথা বলেছিলেন?

৩। দেবী দুর্গার বিসর্জনের পর আর এক দেবীর পুজো হয়। কে এই দেবী?

৪। শ্রীরামচন্দ্রের আগে আর কারা দুর্গার আরাধনা করেছিলেন?

৫। কোন্ মুনি মাতৃগর্ভে 'বেদ' চর্চা করেন? — পরাশর /দুর্বাশা/ কন্ব

নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

২। মহাত্মা গান্ধী

৩। দেবী অপরাজিতা

৪। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য

৫। পরাশর মুনি

*দায়িত্বভার বুঝে নিচ্ছেন বিজেপির নতুন রাজ্য-সভাপতি রাহুল সিন্‌হা।*

# বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে লড়ার বিকল্প শক্তি বিজেপি — রাহুল সিন্‌হা

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** ৩০ অক্টোবর রাজ্য বিজেপির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রাহুল সিন্‌হা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করলে মধ্য চল্লিশের রাজ্য রাজনীতির পরিচিত মুখ রাহুলবাবু সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। দায়িত্ব গ্রহণের পর শ্রী সিন্‌হা জানান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দল ১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চালাবে। ৩০ নভেম্বর তাঁরা বাংলা বনধেরও ডাক দেন। তাঁর মতে, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএম এরা স্বার্থের রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টকে হটানোই বিজেপির মূল লক্ষ্য বলেই এদিন পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা তথাগত রায়, যুগল কিশোর জৈথলিয়া, ইংরেজি দৈনিক দি পাইওনিয়ার-এর সম্পাদক চন্দন মিত্রসহ আরও অনেক বিশিষ্টজন। বিজেপির সংগঠন সম্পাদক অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় রাহুল সিন্‌হার হাতে দায়িত্বভার তুলে দেন।

# উত্তরবঙ্গের 'শারদ পূর্ণিমা' পালিত

গত ৩ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দার্জিলিং জেলায় শারদপূর্ণিমা (লক্ষ্মীপূজা) উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও উৎসব পালন করা হয়। দার্জিলিং নগরের প্রায় ১৮০ জন স্বয়ংসেবক তথা শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত এবং কালিম্পং জেলার সহ জেলা কার্যবাহ রাজবাহাদুর রাই (শিক্ষা)। বিশেষ অতিথি ছিলেন দার্জিলিং অধিবক্তা পরিষদের সচিব সুজাতা অগ্রওয়াল। কার্যক্রমের বিশেষ আকর্ষণ ছিল অমৃতপান অর্থাৎ ক্ষীর (পায়েস) পান। হিন্দু পরম্পরা অনুসারে পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার আলোকচ্ছটা ক্ষীরের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি অমৃতে পরিণত হয়। যা ভোজন করলে শরীরের রোগ-ব্যাধি দূর হয় তথা ঘরের শ্রীবৃদ্ধি হয়। শ্রী রাই ও অদ্বৈতচরণ দত্ত বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। মূলত ওইদিন থেকেই গো-গ্রাম যাত্রার হস্তাক্ষর অভিযান শুরু করা হয় এবং জেলার প্রতিটি গ্রামীণ এবং শহুরে এলাকায় ওই হস্তাক্ষর অভিযান চালানো হবে বলে স্থানীয় স্বয়ংসেবক তথা কার্যকর্তাগণ সংকল্পবদ্ধ হন। কার্যক্রমের দিনে কবাডি সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

# হিন্দু মহিলাদের উপর নির্যাতন বাড়ছে বর্ধমানে

**সুজন কুমার ঃ বর্ধমান।।** হিন্দু মহিলাদের বলাৎকার, হিন্দুর সম্পত্তি লুঠ— এসব এখন শুধু ওপার বাংলার ঘটনা নয়। এরাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত সীমন্তবর্তী জেলাগুলিতে এমন ব্যাধির আবির্ভাব বহু আগেই ঘটেছে। বর্ধমানের মতো অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকাতেও এখন এসব ঘটনা আকছার ঘটছে। আপাতদৃষ্টিতে যা বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলেই মনে হবে। কিন্তু ঘটনার গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করলে যে কোনও সচেতন ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন এর আসল রহস্যটা কী!

ঘটনা এক ঃ বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানা এলাকার পূর্ব খাঁপুর গ্রামে চলতি বছরের এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ ছেচল্লিশ বছর বয়সী এক হিন্দু মহিলা ধর্ষিতা হন পঁচিশ বছর বয়সী এক মুসলিম যুবকের দ্বারা। সেদিন দিনদুপুরে ওই মহিলা গ্রামেরই মাঠের ধারে একটি পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন তার এক মহিলা সঙ্গীর সঙ্গে। অভিযুক্ত যুবক পুকুরপাড়ে গাছের ঝোপের আড়ালে তাদের ওপর নজরদারি রাখছিল। তারা পাড়ে উঠতেই একজনকে ধরে ফেলে। অপর জন পালিয়ে যায়। ওই মহিলা বহু অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও জোর পূর্বক তার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। অপর মহিলা গ্রামে ফিরে সকলকে খবর দেওয়ার আগেই দুষ্কৃতকারী পালিয়ে যায়। ধর্ষিতা ওই পরিবারসহ গ্রামের অন্যান্য হিন্দু পরিবারগুলি ঘটনায় এতটাই ভীত হয়ে পড়েন যে, পুলিশে অভিযোগ করতে যাওয়ারও সাহস পাননি। শেষ পর্যন্ত দুদিন পরে স্থানীয় এক বিজেপি নেতা ধর্ষিতা মহিলাকে নিয়ে গিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করান। ঘটনার এতদিন পার হয়ে গেলেও পুলিশ আজও পর্যন্ত অভিযুক্তকে ধরতে সক্ষম হয়নি।

ঘটনা দুই ঃ ওই গ্রামেই পঁয়ত্রিশোর্ধ এক হিন্দু মহিলা রাতে নিজের বাড়িতে খুন হন। মে মাসের প্রবল গরমের দরুণ স্বামী-স্ত্রী বাড়ির বারান্দায় শুয়ে ছিলেন। ছেলেমেয়েরা ছিল ওপরের ঘরে। স্বামীও চরম আঘাত পান। কলকাতার পিজি-তে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয় তাকে। শেষ পর্যন্ত বেঁচে ফিরেছেন। দুষ্কৃতীদের তিনি চিনতে পারলেও প্রাণ ভয়ে আজও তাদের নাম জানাননি। ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। এই পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতাও নেই। এমনটাই অভিমত স্থানীয় মানুষের। তাহলে এমন খুন কেন? কারাই বা করল এই খুন? সেসব কিছু থেকে গেল রহস্যেই।

ঘটনা তিন ঃ ২৪ আগস্ট রাত্রি। মুসলিম দুষ্কৃতীদের হাতে ধর্ষিতা হন তিন আদিবাসী যুবতী। ঘটনাস্থল মন্তেশ্বর থানা এলাকার আসানপুর গ্রামের একটি পরিত্যক্ত ধানকল। পেটের দায়ে তারা পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানা থেকে এখানে এসেছিলেন চাষের কাজ করতে। এলাকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের চাপে পুলিশ অবশ্য ঘটনার দিন দশেকের মধ্যে দুই অভিযুক্তকে ধরতে সক্ষম হয়। ধৃত দুই ব্যক্তির নাম শেখ আবদুল্লা এবং ফাইগুলা শেখ ওরফে আলমগীর। ধৃতদের বিরুদ্ধে মন্তেশ্বর থানায় চুরি-ডাকাতিসহ একাধিক সমাজবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ আছে বলে পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর।

# মাওবাদী সন্ত্রাসে রক্তাক্ত ভারত

*(৯ পাতার পর)*

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'গণতন্ত্রে হিংসার স্থান নেই। যতদিন না তারা হিংসারপথ পরিত্যাগ করছে ততদিন নিরাপত্তা বাহিনী তাদেরকে প্রতিহত করবে।'

মাওবাদী বিরোধী অভিযান, প্রভাবিত রাজ্যগুলির ১১টি জেলায় চালানোর পরিকল্পনা হচ্ছে। এই জেলাগুলি ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড সন্নিহিত এবং বহু চর্চিত রেড করিডরের গভীর জঙ্গলেও রয়েছে।

মাওবাদী তথা অতিবাম লাল সন্ত্রাস এই সময়ে দেশের কুড়িটি রাজ্যের ২২৩টি জেলার প্রায় ২০০০ থানাকে প্রভাবিত করেছে। ছত্তিশগড় প্রদেশের লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ বস্তার জেলার ৪০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা এই অঞ্চলেই রয়েছে। এটাই একক বৃহত্তম এলাকা। এখানে মে মাস পর্যন্ত ৬৭ জন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান মাওবাদীদের হাতে নিহত হয়েছে। এক অনুমান অনুসারে মাওবাদীদের দশ থেকে পনেরো হাজার সুশিক্ষিত গেরিলা বাহিনী রয়েছে। তারা সংকল্পে দৃঢ় এবং আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত। এছাড়া কয়েক হাজার মিলিশিয়া তাদের চোখ-কান হিসেবে কাজ করে।

কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে মাওবাদী সন্ত্রাস মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদী সর্বাত্মক অভিযানের পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়েছে। এই অভিযান একবছর থেকে তিনবছর স্থায়ী হবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জি কে পিল্লাই-এর কথায়, "একই সঙ্গে ওই এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুলিশী পরিকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ণের প্লাবন বইয়ে দেওয়া হবে। তিরিশ দিনের মধ্যেই এলাকার নিয়ন্ত্রণ ও নাগরিক প্রশাসন কার্যকরী করা সম্ভব।" বস্তারের মতো গভীর বনাঞ্চলে কাজটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ। সরকার ইতিমধ্যে ঝাড়খন্ডে ব্যাপক উন্নয়ণ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

প্রথম ধাপ হিসেবে বিশ্বাস অর্জনের জন্য ঝাড়খন্ডে জনজাতিদের এক লক্ষের উপর মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতদঞ্চলে গরীব গ্রামীণ মানুষেরা মাওবাদী আন্দোলনে আন্দোলিত বা উদ্বেলিত বলা যেতে পারে। তবে মাওবাদীদের কাজকর্ম নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। তাদের দাবী — তারা গরীব গ্রামীণ মানুষের জন্য লড়াই করছে। অভিযোগ— মাওবাদীরা ভয় দেখিয়ে গ্রামের মানুষকে দলে ভেড়াচ্ছে। এমনকী মাওবাদীরা ভয় দেখিয়ে বা জোর করে টাকা তুলছে বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, লালগড়ে জনগণের কমিটি লালগড় ব্লক অফিসের কর্মীদের কাছে কয়েক হাজার টাকা জনপ্রতি চাঁদা ধার্য করতে বিডিও পালিয়ে গিয়েছিলেন। ঝাড়গ্রাম মহকুমা শাসক ঝাড়গ্রামেই অফিস চালাতে বলেছিলেন। এটা মে-জুন মাসের কথা। আগেকার নকশালরা ছিল ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী। একটি সংবাদপত্রে গ্রাফিক্স-এ দেখানো হয়েছে কত নির্দোষ মানুষ নকশালী (মাওবাদী) হিংসার বলি।

# সংস্কার ভারতীর ‘বীর সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গ

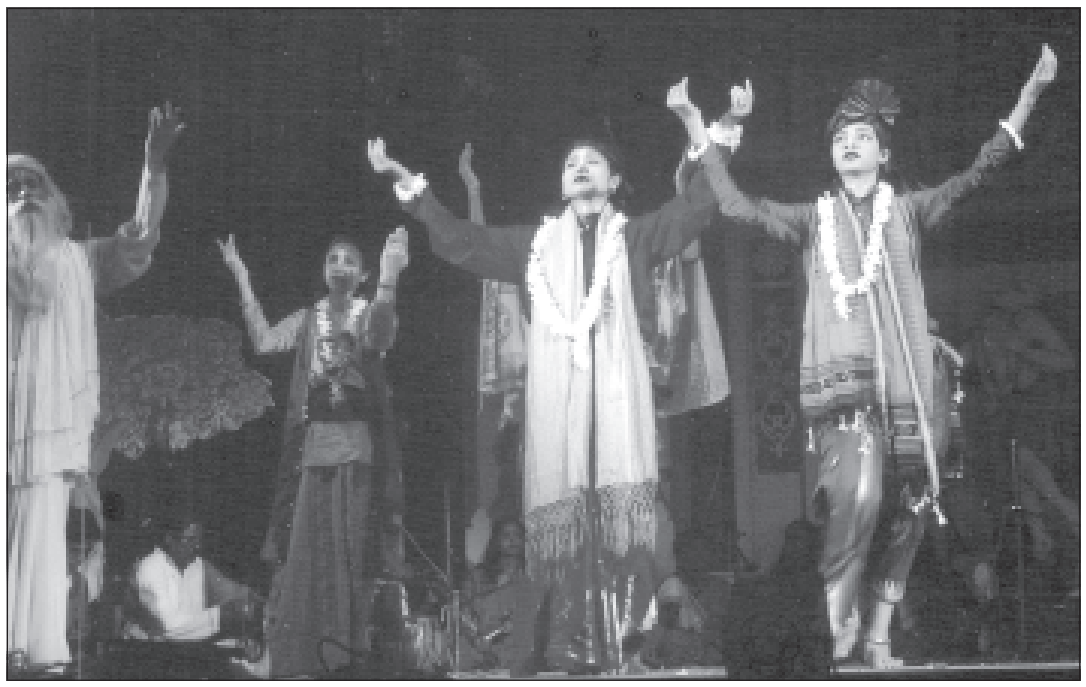

*সিউড়ির রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত ‘বীর সন্ন্যাসী শ্রী গৌরাঙ্গ’ নাটকের একটি দৃশ্য।*

বিকাশ ভট্টাচার্য।। বাংলা জুড়ে তখন একদিকে প্রচণ্ড খরা, অন্যদিকে ইসলাম শাসনে উৎপীড়িত দেশের মানুষ। ঠিক এইরকম সময়ে ১৪০৭ শকাব্দের ২৩ ফাল্গুন (ইং ১৪৮৬ খৃস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি) সূর্যাস্তের ঠিক পরেই নবদ্বীপ ধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তাঁর

**রঙ্গম**

বয়স যখন ষোলো বা সতেরো, তখন পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে গয়ায় যান। সেখানে তিনি পরম বৈষ্ণব শ্রীঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নেন। নদীয়ায় ফিরে এল যেন এক অন্যমানুষ। কৃষ্ণনাম শুনলেই তিনি ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়ে ঘন ঘন মূর্ছা যান, ভদ্ভাবে আবিষ্ট হয়ে উন্মাদের মতো আচরণ করেন। সেই সময় থেকে তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল নবদ্বীপ বা নদীয়াতেই নয়, আশেপাশের নগর ও গ্রামে ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়ান। ভক্তদের নিয়ে হাটে-ঘাটে সর্বত্রই নাম সংকীর্তন করে বেড়ান। শুধু অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস বা শ্রীবাসই নন, চাঁদকাজী থেকে জগাই-মাধাই-এর মতো প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসে বিরোধী শত শত মানুষও সেদিন শ্রীচৈতন্যের পতাকাতলে মিলিত হন। এই সময়ে তিনি অনুভব করেন, যতদিন নদীয়াবাসী রূপে তিনি কোনও বিশেষ পরিবারভুক্ত থাকবেন, ততদিন তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। তিনি তখন কোনও এক বিশেষ পরিবার, গোত্র এবং সমাজের অন্তর্ভুক্ত না থেকে সারা বিশ্বের আপনজন হওয়ার সংকল্প নেন এবং মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গৃহের ক্ষুদ্রজগৎটি পরিত্যাগ করে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সারা বিশ্বের সমস্ত জীবেদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তহীন চিন্ময় জগতে প্রবেশ করেন। এবছরটা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পাঁচশো বছর। এই উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতীর সিউড়ি শাখা এক অনবদ্য নৃত্যনাট্য “বীর সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গ” প্রস্তুত করেছে। ভাষ্যপাঠের সঙ্গে নৃত্য ও অভিনয়, সঙ্গীত-এর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই প্রযোজনায়। সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখা এই প্রয়োজনটি সারা বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ করে শ্রীচৈতন্যের জীবন ও কর্মকে মানুষের সামনে তুলে ধরার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। নিঃসন্দেহে এক সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত।

সম্প্রতি “বীর সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গ”-র প্রথম অভিনয় হয়ে গেল গত সিউড়ির রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সেদিন উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী গোরা সর্বাধিকারী, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক কার্যকরী উপদেষ্টা সুভাষ ভট্টাচার্য।

আলেখ্যটির ভাষ্যরচনা করেছেন ডঃ অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুললিত কণ্ঠে তা পাঠ করেছেন পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, কাজল চক্রবর্তী ও সৃজনী আচার্য। সঙ্গীত পরিচালনা ও কণ্ঠদানে প্রবীর দাস, নৃত্য পরিচালনাসহ নৃত্যে অংশ নেন মৌমিতা বিষ্ণু। দৃশ্যায়নে শিপ্রা মুখার্জি। অপূর্ব মঞ্চ সজ্জার জন্য প্রশংসা পাবেন প্রসাদ কাহার। রূপসজ্জায় কান্ত কাহার এবং আলোক পরিকল্পনায় ছিলেন তমালকৃষ্ণ দাস। ব্যবস্থাপনায় স্বাধীন ধর। নৃত্যনাট্যটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিলক সেনগুপ্ত। নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীতে অংশ নিয়েছেন মোট একচল্লিশ জন শিল্পী। সকলের নাম উল্লেখ করা না গেলেও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কুশীলব প্রত্যেকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করায় সমগ্র প্রযোজনায় এক অপূর্ব টিমওয়ার্ক কাজ করেছে।

*সংস্কার ভারতী’র সিউড়ি শাখা এই অনবদ্য প্রয়াসের জন্য প্রশংসা পাবে।*

# ছোট বাঙালের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ

**শিবাজী গুপ্ত**

একটি দৈনিক পত্রিকার গত শারদীয় সংখ্যায় জনৈক লেখক পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী তথা সিপিএমের শাসনকে 'ছোট বাঙালের' রাজত্ব বলে অভিহিত করায় কিছু তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে ' ছোট বাঙাল-বড় বাঙাল' প্রশ্নটি অবধারিতভাবে উঠে এসেছে। কিন্তু ছোট বাঙালের রাজত্ব কায়েমের প্রেক্ষাপটটি কেউ গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন বলে মনে হয় না।

বাংলা যখন ভাগ হয়ে গেল, সে সঙ্গে বাংলার কংগ্রেস দলও দুভাগ হয়ে গেল ঃ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও পূর্ববঙ্গ / পাকিস্তান কংগ্রেস। অবিভক্ত বাংলার বিধানসভার হিন্দু কংগ্রেস সদস্যরাও দুই বাংলার বিভক্ত বিধানসভার সদস্য হিসাবে ভাগ হয়ে গেলেন। যারা পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকাস্থিত বিধানসভার সদস্য হিসাবে কলকাতা ছেড়ে গেলেন, তাদের মনোবেদনা আজ কেউ বুঝতে পারবে না।

পূর্ববঙ্গ কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কেউই তখন দেশত্যাগ করেননি। তবে তারা যে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, তারা সারাজীবন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সংগ্রাম করেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন, মুসলিম লীগের দেশভাগের দাবীর বিরোধিতা করে তাদের চক্ষুশূল হয়েছেন এবং গান্ধীজীর নির্দেশে দেশভাগ হবে না বলে হিন্দুদের আশ্বস্ত করেছেন। আচমকা দেশভাগ হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেস নেতারা পাকিস্তানের বিরোধিতা করার জন্য মুসলমানদের যেমন চক্ষুঃশূল হলেন, তেমনি হিন্দুদের কাছেও তাদের মুখ দেখাবার জো রইল না। তাদের মুখের দিকে তাকালে নির্বাক অভিযোগের তীর এসে বুকে বিঁধে ঃ তোমরা এ কী করলে? নেকড়ের মুখের সামনে আমাদের ছেড়ে দিলে!

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কি ছিল, তার কেমন ছিল, তা নিয়ে বাগাড়ম্বর করতে চাই না; কিন্তু তারা কি হারিয়েছে তারা বেদনা তারাই জানে; তার কিঞ্চিৎ অনুভব করছিলেন গান্ধীজি। হিন্দুদের এই সার্বিক সর্বনাশের জন্য একমাত্র গান্ধীজির হৃদয়ই কেঁদেছিল--যেহেতু তিনি হিন্দুদের বিধ্বস্ত সংসার ও সমাজ জীবনের ভগ্নদশা দেখেই অদূরে ভবিষ্যতে সারা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বিপর্যস্ত জীবনের ছবি তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন। যে স্বাধীনতার জন্য পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করল, দুঃখ বরণ করল, তারা হবে উদ্বাস্তু--এই চিন্তায় মহাত্মার হৃদয়ে রক্ত ক্ষরিত হয়েছিল। বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাই তিনি বলেছিলেন ঃ---"My heart bleeds, my brain is strained to think that the East Bengal Hindus who were in the vanguard in the struggle for freedom, will be deprived of their ancestral home and hearth."

যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই ঘটল। ১৯৫০-এর প্রলয়ঙ্কর দাঙ্গায় সমগ্র পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এবং প্রায় ৫০ লক্ষ হিন্দু প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট সুনামি'র মতো একযোগে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে আছড়ে পড়ল। এই ছিন্নমূল মানব গোষ্ঠীর মধ্যে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি সকল দলের নেতা ও কর্মীরাই ছিলেন। অন্যান্য দলের ক্ষেত্রে যাই হোক, মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর এবং ছেচল্লিশের ১৬ আগস্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও হরতালের সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টিকেও তারা রেয়াত করেনি। কমিউনিস্ট হলেও হিন্দু তো! সে অপরাধ তাদেরও। পূর্ববঙ্গ থেকে ঝাড়েবংশে তাড়ালে। রিফিউজী নামাঙ্কিত হয়ে হিন্দু কমিউনিস্টরাও পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে বাঁচল।

বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকটি ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) ভুলে ভরা রাজনীতির দশক। সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কে রাতারাতি জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা ও যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন, ভারত ছাড়ো আন্দোলনকারীদের ধরপাকড়ে পুলিশের ইনফরমার হিসাবে কাজ করা, ৫০-এর মন্বন্তরের সময় মিলিটারির জন্য খাদ্য সংগ্রহ ও চলাচলে সহায়তা করা, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজীর নামে কুৎসা ও নিন্দা কীর্তন, মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সমর্থন জ্ঞাপন ইত্যাদি দেশদ্রোহী ও জাতিদ্রোহী অপকর্মে কমিউনিস্টদের তখন লোকসমাজে মুখ দেখানো ভার। তদুপরি কাকদ্বীপ ও দমদম-

> **"পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু কংগ্রেস নেতাদের সাদরে গ্রহণ তো দূরের কথা বরং কংগ্রেস থেকে এক ধরনের 'বাঙাল খেদা' নীতি অনুসৃত হল। অথচ এই কংগ্রেস নেতারা বেঁকে বসলে এতো সহজে দেশভাগ হতো না।"**

বসিরহাটে বিপ্লবী ছেলেখেলা খেলতে গিয়ে পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হল এবং অধিকাংশ নেতা নিবর্তনমূলক আটক আইনে আটকা পড়ল। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত নির্যাতিত কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের সাদরে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বরং তাদের অবাঞ্ছিত ও অপাংক্তেয় করে দূরে সরিয়ে রাখে। আর ক্যাম্প-কলোনী, রেল স্টেশন ও লাইনের দুপাশে ও শহরের ফুটপাথে যে লক্ষ লক্ষ সর্বহারা উদ্বাস্তু মনুষ্যেতর জীবন যাপন করছিল, তাদের কাছে একটু দরদভরা ও সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস দল ও নেতারা পাশে দাঁড়াননি। উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের যেটুকু ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে তা কর্মবীর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রচেষ্টার ফল। কংগ্রেস দল তার জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারে না। তারা তো সর্বহারা উদ্বাস্তুদের জঞ্জাল বলেই দূরে সরিয়ে রাখল।

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু কংগ্রেস নেতাদের সাদরে গ্রহণ তো দূরের কথা বরং কংগ্রেস থেকে এক ধরনের 'বাঙাল খেদা' নীতি অনুসৃত হল। অথচ এই কংগ্রেস নেতারা বেঁকে বসলে এতো সহজে দেশভাগ হতো না। এরা যেদিন দেশভাগে সম্মতিদানে দিল্লী যাচ্ছিলেন তাদের সেদিনের বেদনা ও অশ্রুবিসর্জনের ছবি সাংবাদিকের কলমে ধরা পড়েছে ঃ---

"উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব এবং বাংলার যে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে সেখানকার এ.আই.সি.সি. সদস্যদের মধ্যে বাংলার শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, সতীশ সেন, ধীরেন দত্ত, হেমপ্রভা মজুমদার, কিরণশঙ্কর রায়, প্রভাস লাহিড়ী, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গাফফর খান, খান আবদুল গণি, বেলুচিস্তানের খান আবদুল সামাদ খানরা দিল্লী পৌঁছানোর পথে ট্রেনে সারারাত অশ্রুবর্ষণ করেছেন। তাঁদের সারা জীবনের সংগ্রাম ও সাধনা দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে ধূলিসাৎ হতে যাচ্ছে।" (বঙ্গ সংহার এবং .....সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত)

এসব সর্বত্যাগী দেশসেবকদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কাছে অতুল্য ঘোষ অ্যান্ড কোং তো চুনোপুঁটি।

সোনার সংসার ছাই হয়ে যাওয়া উদ্বাস্তুদের চোখেমুখে তখন শুধু হতাশা নিরাশা বঞ্চনা ও শূন্যতার ছবি। তার ওপর সামনে ভাসছে সোনার বাংলার মাটি ফেলে ও মায়া কাটিয়ে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসন ও আন্দামানে দ্বীপান্তরের বিভীষিকা। স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এই কি তার পুরস্কার ও প্রতিদান!

কমিউনিস্ট পার্টি উদ্বাস্তু জীবনের এই হতাশা ও শূন্যতার পূর্ণ সুযোগ নিল। তারা "আমরা কারা---বাস্তুহারা" বলে উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়াল। তাদের দুঃখে মায়া কান্না কাঁদল। তাদের নিয়ে সভা সমাবেশ শোভাযাত্রা ধর্না বিক্ষোভ দেখাতে লাগল। ধর্মঘট পথ অবরোধ পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি লাঠি, টিয়ারগ্যাস এবং গুলি চালানোর মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে উদ্বাস্তুদের কাছের মানুষ বলে নিজেদের পরিচিত করল।

ডুবন্ত মানুষ যেমন বাঁচার তাগিদে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডকে আঁকড়ে ধরে, সর্বহারা উদ্বাস্তুরাও তেমনি ফেরেববাজ কমিউনিস্টদের কলঙ্কময় অতীত ইতিহাস ভুলে পরিত্রাতা রূপে তাদের পেছনে ছুটল। তারা উদ্বাস্তুদের নিয়ে দণ্ডকারণ্যগামী ট্রেন আটকাল; খিদিরপুর ডকে আন্দামানগামী জাহাজ থেকে উদ্বাস্তুদের ট্রেনে নামাল এবং পোর্টব্লেয়ারে তাদের নামাতে বাধা দিয়ে উদ্বাস্তুদের মন জয় করে নিল।

উদ্বাস্তুদের বাংলার বাইরে পুনর্বাসনের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং ভোটার লিস্টে উদ্বাস্তুদের নাম ঢুকিয়ে কমিউনিস্টরা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর এক 'রেডিমেড' ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করে এবং ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনেই বৃহত্তর কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রিফিউজি বেল্টে দলের শক্তপোক্ত ভিত গড়ে তুলে পশ্চিমবঙ্গে "ছোট বাঙালের রাজত্বের" পত্তন করল। তার পরের ইতিহাস তো সবার জানা।

উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য সিপিএম যে জানপ্রাণ দিয়ে লড়েছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। উদ্বাস্তুরাও হাত উপুড় করে তাদের ভোট দিয়েছে। সে-সঙ্গে সিপিএম মুসলমানদের আশাতিরিক্ত পেয়ার দেখিয়ে মুক্তাঞ্চলদের ভোটও কবজা করে। ফলে, দুটি বৃহৎ গোষ্ঠীর একচেটিয়া ভোটের জোরেই সিপিএম ৩২ বছর গদীতে ফেবিকল হয়ে বসে রয়েছে। বর্তমানে এই দুটি শক্তিশালী গোষ্ঠীই সিপিএম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বলেই 'ছোট বাঙালের' হাত থেকে শাসনদণ্ড খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। মানুষ 'বড় ঘটি'র সুশাসনের অপেক্ষায় আছে!

## দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতাতে গো-পূজন

এক বর্ণাঢ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে গত ২৪ অক্টোবর কলকাতার ভি আই পি নগর অঞ্চলে গোমাতা পূজন অনুষ্ঠিত হোল। গোমাতা পূজনের পিছনে গো-সংরক্ষণ ও কৃষি কাজের যে মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, বক্তাদের বক্তব্যে এদিন তা ফুটে ওঠে। স্থানীয় মানুষ যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে গো-পূজন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। বহু সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে গো-পূজন উৎসব সম্পন্ন হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির দেখভাল করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ-পূর্ব সহভাগ কার্যবাহ মানিক দে সহ সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বয়ংসেবকেরা।

## সমরসতা মিশনের গো-গ্রাম পূজন

শঙ্খনাদ সমরসতা মিশন-এর উদ্যোগে ২৫ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং ভাঙড় ব্লকের সীমান্ত গ্রাম কালুগাছিতে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা উপলক্ষে গো-পূজন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন গ্রামের ১৫৭টি পরিবার থেকে ২৬২টি গাই-গোরু পুজোর জন্য নিয়ে আসা হয়। এর পাশাপাশি এদিন শঙ্খনাদ সমরসতা মিশন ও পতঞ্জলি যোগ সমিতির (গিরীশ পার্ক শাখার) ৬০ জন প্রতিনিধি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলি পর্যবেক্ষণে যান। যেখানে এখনও অনেক গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। এই গো-পূজনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমরসতা মিশনের সভাপতি পি কে চৌবে, সহ-সভাপতি জয়গোপাল গুপ্তা, সম্পাদক বালকৃষ্ণ লুন্ডিয়া, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ দীনেশ গোয়েল, গোরক্ষা সমিতির প্রমুখ শিবকুমার শুক্লা, গো-গ্রাম যাত্রার স্বাগত সমিতির প্রান্ত সম্পাদক দিলীপ আঢ্য। তিনি গো-গ্রাম যাত্রার গুরুত্বের কথা উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরেন। গুলজারিলাল বাগারিয়া সারদা শিশু মন্দিরের কচিকাঁচারা এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

## বিজয়া-মাতৃসম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলার কামারহাটি নগরের বিজয়া মাতৃসম্মেলন গত ২৫ অক্টোবর বেলঘরিয়া প্রবর্তক হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল। সভানেত্রী তথা মুখ্য পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন শ্রীমতী রমা সেন। মা-বোনেরা এই অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের উত্তর ২৪ পরগণা বিভাগের সহ সঙ্ঘচালক মানস মিত্র।

## স্মরণসভা

২৪ অক্টোবর বহরমপুরের কালেক্টরী ক্লাবে মুর্শিদাবাদ জেলার বিজেপি'র প্রয়াত সভাপতি বংশীধর চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় বিজেপির কার্যকর্তা ও কর্মীরা প্রয়াত বংশীধরের স্মৃতিচারণ করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভানেত্রী মালা ভট্টাচার্যও। বংশীধর চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কমান্ডেন্ট ছিলেন। কর্মজীবনে অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। অসবর জীবনে নিজের জীবনের ষোলোআনা উৎসর্গ করেন বিজেপির কাজে। প্রথমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরে বিজেপির মুর্শিদাবাদ জেলার সভাপতির দায়ভার গ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, পুত্রবধূ ও এক নাতনি রেখে গেছেন।

## শোক সংবাদ

চলে গেলেন দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক শচীন গঙ্গোপাধ্যায়, গত ২৭ অক্টোবর রাত ১১টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। স্ত্রীসহ তার দুইপুত্র পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিরা বর্তমান। প্রখ্যাত শচীনবাবু সঙ্ঘ ছাড়াও জনসঙ্ঘ এবং বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে সক্রিয় ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন শিক্ষক।

সমাবেশ সমাচার

## সংশোধনী

গত ২৬ অক্টোবর স্বস্তিকা-র ১৩ পৃষ্ঠায় 'শোক সংবাদ' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে নিম্নোক্ত অংশটি "বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও সরস্বতী শিশু মন্দিরের সভাপতি অধ্যাপক তাপস চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদেব দেবদাস চট্টোপাধ্যায় (৭৮) গত ৭ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন" পড়িতে হইবে।

ওই 'শোক সংবাদ' শিরোনামের নিম্নোক্ত অংশটিও "চলে গেলেন বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক গোপীনাথ দাস-মোদক-এর পিতৃদেব শঙ্কর দাস মোদক' পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

— সঃ স্বঃ

Swastika
9 November - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

# উত্তরবঙ্গে সাড়া জাগালো বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা

শিলিগুড়িতে বক্তব্য রাখছেন সীতারাম কেদিলাই। বসে - রামনয়ন দাস মহন্ত, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যপদ পাল ও অন্যান্যরা।

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** বিগত বিজয়া দশমীর দিন কুরুক্ষেত্রে যে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই যাত্রা গত ৩০ অক্টোবর সকাল দশটায় বিহার সহ পাঁচটি রাজ্যের সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে দুটি সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ দশটি গাড়ির কনভয় নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার ফাঁসিদেওয়ায় পৌঁছায়। সেখানেই উত্তরবঙ্গের বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সংযোজক ডাঃ গৌতম সরকার যাত্রাকে স্বাগত জানান। সভার পর দুপুর সাড়ে বারোটায় যাত্রা জলপাইগুড়ি পৌঁছায়। সেখানে জেলা স্বাগত সমিতির কার্যকর্তারা যাত্রাকে স্বাগত জানান। প্রচণ্ড রোদে কয়েকশ' ছাত্র-ছাত্রী ও মা-বোনেরা উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি সহকারে যাত্রাকে অভ্যর্থনা করেন। সভা ও গো-পূজন হয় অরবিন্দ ব্যায়ামাগার ও পাঠাগার ক্লাব ময়দানে। জলপাইগুড়ি থেকে যাত্রা বিকেলে শিলিগুড়ি শহরে পৌঁছায়। যুবকদের বিশাল মোটর বাইক বাহিনী গৈরিক পতাকা লাগিয়ে যাত্রাকে স্বাগত করে। অনুষ্ঠানস্থল হিন্দী হাইস্কুল প্রাঙ্গণে নিয়ে আসেন। ওখানে সভার আগে গায়ত্রী পরিবারের উদ্যোগে বৈদিক শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সীতারাম কেদিলাই, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদ সারাওগী, দীনদয়ালজী শাহ এবং অযোধ্যার দিগম্বর আখড়া থেকে আগত মহন্ত রামনয়ন দাস মহারাজ। তিনিই শপথবাক্য পাঠ করান। সভা পরিচালনা করেন কমল পুগলিয়া এবং ধন্যবাদ জানান প্রবীণ আগরওয়াল। গায়ত্রী পরিবারের পক্ষ থেকে সকলের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

খড়িবাড়িতে গো-পূজন করছেন মহন্ত রামনয়ন দাস।

গত ৩১ অক্টোবর সকাল আটটায় শিলিগুড়ি থেকে গো-গ্রাম যাত্রার পথচলা শুরু হয়। এরপর যাত্রা নকশালবাড়ি, বাতাসী হয়ে সকাল দশটায় খড়িবাড়ি পৌঁছায়। সেখানেও হাইস্কুল মাঠে জনসভা, গো-পূজন ও গোরক্ষার শপথবাক্য পাঠ হয়। এদিন দুপুরে যাত্রা ঈশ্বরপুরে (ইসলামপুর) পৌঁছালে রাস্তার দু-পাশে সহস্রাধিক মা-বোন ও ছাত্র-ছাত্রীরা যাত্রাকে প্রত্যুদ্গমন করে কোর্ট ময়দানে নিয়ে যান। সেখানেও জনসভা, গো-পূজন ও শপথবাক্য পাঠ হয়। বক্তব্য রাখেন দীনেশজী, ভাস্করজী এবং মহন্ত রামনয়ন দাসজী। মাঠে প্রখর রোদেও দু-হাজারের বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পথে ডালখোলা এবং করণদীঘিতে যাত্রাকে সর্বসাধারণ জনতা স্বাগত জানান। সন্ধ্যা নাগাদ যাত্রা রায়গঞ্জে পৌঁছায়। বিদ্যাচক্র হাইস্কুল ময়দানে জনসভা, গো-পূজন ও শপথবাক্য পাঠ হয়। বক্তব্য রাখেন, উত্তম দাস, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নারায়ণ সাহা। পরদিন যাত্রাকে কালিয়াগঞ্জ শ্রীরাম-লীলাদেবী গোশালার কর্মকর্তারা স্বাগত জানান। ভাষণ দেন যাত্রার সর্বভারতীয় সংযোজক শংকরলালজী। তখনও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। পথে দৌলতপুর। ঢাক-বাদ্য, সংকীর্তন সহ হাজার হাজার মানুষ যাত্রাকে স্বাগত করলেন। এখানেই বোঝা গেল গো-গ্রাম যাত্রা বাম-বাংলাকে যথার্থ অর্থে রাম-বাংলায় পরিণত করেছে।

এরপর যাত্রা মঙ্গলবাড়ি হয়ে মহানন্দা সেতু পার করে মালদায় প্রবেশ করে। মালদাতেও অনেক গাড়ি ও মোটরবাইক মিছিল যাত্রাকে স্বাগত করে হিন্দী হাইস্কুল ময়দানে নিয়ে যায়। সেখানেও জনসভা। বক্তব্য রাখেন শঙ্করলালজী এবং রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ফরাক্কা ব্রীজ পার হয়ে আহিরণ। বিশাল মোটর সাইকেল বাহিনী। শতাধিক যুবক জয়ধ্বনি দিচ্ছে গলা ফাটিয়ে। যাত্রা সন্ধ্যায় পৌঁছাল রঘুনাথগঞ্জ। ওখানেও বিরাট জনসভা। এরপর যাত্রা বহরমপুরে পৌঁছায়। ওখানে জনসভায় বক্তব্য রাখেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দ, উত্তম দাস এবং ডঃ দীনেশজী। বহরমপুরে রাত্রিবাস করে যাত্রা গত ২ নভেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতার কাঁকুড়গাছি পার্কে পৌঁছায়। তার আগে বেথুয়াডহরী, শান্তিপুর ও বারাসাতে স্বাগত অভ্যর্থনা ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জলপাইগুড়িতে গো-গ্রাম যাত্রাকে স্বাগত করা হচ্ছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের দৌলতপুরে জাতীয় সড়কে ভক্তদের উপচে পড়া ভীড়। (গো-গ্রাম যাত্রার ছবিগুলি তুলেছেন বাসুদেব পাল)

সব মিলিয়ে যেন জনপ্লাবন বয়ে গেল। সুসজ্জিত ট্রাকে গো-মাতার মূর্তি দর্শন, পূজন ও দানপাত্রে অর্থদানে সর্বত্রই উৎসুক ভাব-বিহ্বল জনতা।

প্রকাশিত হবে ১৬ নভেম্বর '০৯
স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ
এম টিভি থেকে এম-পি থ্রি – সবেতেই কবিগুরু। সবার কণ্ঠে আজও সেই মনভোলানো গানের গুণগুণ সুর। তবু তাঁর রচনা এখনও স্বপ্ন দেখায়। কবিগুরুর গীতাঞ্জলির এবার শতবর্ষ। এই উপলক্ষে স্বস্তিকার শ্রদ্ধাঞ্জলি – কবিগুরুর গীতাঞ্জলি।
।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ত্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101
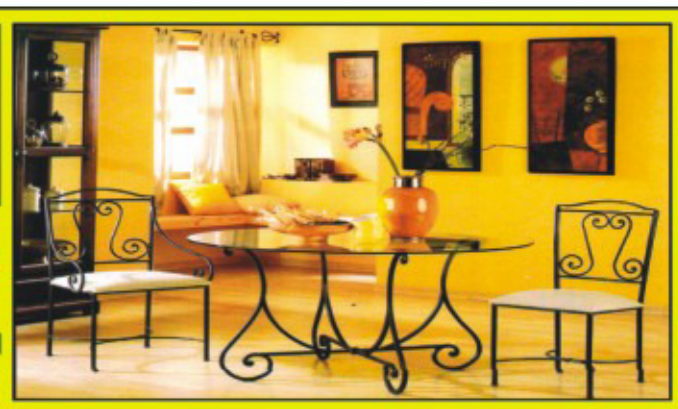

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com